রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কলিকাতা পুস্তকালয় (প্রাইভেট) লিমিটেড
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন
শ্রীমণীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা পুস্তকালয় (প্রাইভেট) লিমিটেড
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
হৈমন্তি সেন

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন
মোহন প্রেস

ছেপেছেন
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই করেছেন
ভারতী বুক বাইণ্ডার্স

দাম তিন টাকা

উৎসর্গ

একমাত্র যিনি আমার সম্বন্ধে বলতে পারেন—

আনিলাম অপরিচিতের নাম

ধরণীতে।

পরিচিত জনতার

সরণীতে।

সেই প্রবীণ সম্পাদক ও চিরনবীন কথা-সাহিত্যিক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে—

আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থটী উৎসর্গ করলাম।

রবি

ভূমিকা

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের মধুরতম ভাষা বাঙলায় 'চীন থেকে ভারত' নামে ইউয়ান চোয়াং সম্বন্ধীয় একখানি বই দক্ষতার সঙ্গে লিখেছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। লেখকের আলোচ্যবিষয়টি এত চিত্তাকর্ষক যে এ গ্রন্থের তথ্যের কথা উল্লেখ না করেও বলা যেতে পারে যে এর আবেদন বহুবিস্তৃত হবে।

ইউয়ান চোয়াং শুধু যে একজন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ-তীর্থপর্যটক। উপরন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত, তাঁর রচনাশক্তি ছিল সুনিপুণ। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের তৎকালীন রাজধানী চং-আন থেকে তিনি একাকী পদব্রজে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে পৌছান। পথে তাঁকে যে সকল বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। ইউয়ান চোয়াং দশ বছরেরও অধিককাল ভারতবর্ষে কাটিয়ে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চং-আন প্রত্যাগমন করেন। ভারতবর্ষে থাকবার সময় তিনি যে গভীর জ্ঞান আহরণ করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি ভারতবাসীদের কাছ থেকে দুটি উপাধি পেয়েছিলেন 'মহাযানদেব' এবং 'মোক্ষদেব'। দেশে ফিরে যাবার সময় ইউয়ান চোয়াং সংস্কৃতভাষায় লেখা ৬৫৭ খানি ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে যান। দেশে পৌছে তিনি সেই গ্রন্থগুলি অনুবাদ এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। অবশেষে তিনি ৭৫খানি সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই ৭৫খানি গ্রন্থ ১৩৩৫টি খণ্ডে বিভক্ত। এ ছাড়াও ইউয়ান চোয়াং 'পাশ্চাত্যভ্রমণবৃত্তান্ত' নামে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন এবং আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার একটি মহামূল্যবান সামগ্রী। ইউয়ান চোয়াং-এর এরূপ গভীর পাণ্ডিত্য দেখে চীনের সম্রাট তাঁকে 'ত্রিপিটক ধর্মগুরু' উপাধি দিয়েছিলেন। এই সকল নানা বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে।

কিন্তু এ সবের চেয়েও ইউয়ান চোয়াং-এর বড় পরিচয় হল তাঁর মহান আত্মত্যাগ, উচ্চ আদর্শবোধ, অসাধারণ চরিত্রবল এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। চীন ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগস্থাপনে এবং এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টায় তাঁর দাম আজও তুলনারহিত।

ইউয়ান চোয়াং-এর জীবনী এবং রচনাবলী নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করেছেন এবং নানা ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। ভারতবর্ষে এ বিষয়টির অনুশীলন বেশি হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। আশা করি ডাঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থখানি এ বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

তান য়ুন-শান
Tan Yun-Shan
譚雲山

বিশ্বভারতী চীনা ভবন
শান্তি নিকেতন ৫ই মে '৫৭

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তার রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছে যে তাতে সমগ্র বিশ্বের লোক বিস্মিত না হয়ে পারেনি। সেই পরিবর্তন আবার বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতিতে। শান্তির পবিত্র ও মঙ্গলময় পথের পথিক ভারতবর্ষ আজ পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমস্ত পৃথিবীকে বেঁধে ফেলেছে আন্তরিক মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে।

ভারতবর্ষের নিকট প্রতিবেশী মহাচীনের সঙ্গে সে সৌহার্দ ও মৈত্রীবন্ধন নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই হয়ে উঠেছে প্রগাঢ়তর। ভারতের লোক মহাচীনের অধিবাসীকে আজ আত্মার আত্মীয় বলেই গণ্য করে এবং মহাচীনের অধিবাসীদের মনোভাবও ভারতবাসী সম্পর্কে অনুরূপ। ভারত ও মহাচীনের প্রধানমন্ত্রীদের এই উভয়দেশ কয়েকবার ভ্রমণের সময়ে উভয় রাজ্যের প্রীতির সম্বন্ধ যে কত গভীর ও কত আত্মিক তার প্রমাণ আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে দেখেছি।

আন্তরিকতার এই যে সুবিপুল গভীরতা, উভয় দেশের জনগণের মধ্যে এই যে মধুর মানসিক সংযোগ—এটা কি শুধুই সাময়িক? না এটা পিছনে ফেলে আসা বহুযুগের একটা মহান ঐতিহ্যের ফল? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে অতীতের বহু ভারতীয় ও চৈনিক মনিষীদের সঙ্গে পেলাম হিউয়েন-সাঙকে। আর সেই প্রশ্ন-বৃক্ষেরই ফল হল এই "চীন থেকে ভারত"।

অতীতের চীন-ভারত সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন যে সব মনিষী তাঁদের মণিমালার মধ্যে হিউয়েন-সাঙ-ছিলেন উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। একটা কথা বললেই বোধ হয় তাঁর এই পরিচয়টুকু পরিষ্কার হয়ে যায় যে অতীতের ভারতবর্ষের যদি কোন সুসংবদ্ধ ইতিহাস আজ রচনা করতে হয় তবে হিউয়েন-সাঙকে বাদ দিয়ে তা কোন রকমেই সম্ভব নয়।

এই মহামনিষীর জীবনী ও ভ্রমণ আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল কয়েক বৎসর পূর্বে। তাই তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানবার আগ্রহ নিয়ে তাঁর ইতিহাস পরিক্রমার কাজে লেগেছিলাম। সাঙের জীবনী ও ভ্রমণের

ইতিহাস পড়তে পড়তে সেদিন সেই মহামানবের হিমালয়ের মতো সুউচ্চ ধ্যান-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ছোঁওয়া বার বার প্রাণে অনুভব করে অভিভূত হয়েছিলাম। ইতিহাসকে সেদিন শুধু শুক্‌নো তথ্যের রাশি বলে মনে করতে পারিনি। মানসক্ষেত্রে সেই কালজয়ী পরিব্রাজকের প্রশান্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কাণে বেজেছিল তাঁর অমর বাণী।

প্রভাতে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় ও সারাদিন পৃথিবী পরিক্রমণ করে কেন জানেন? তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্ধকার নাশ করা।—সাঙের নিজেরই চরিত্র ছিল সূর্যের মতো ভাস্বর। তাই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন জগতের অন্ধকার নাশ করবার কাজে।

এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রেরণাতেই রচনা করেছিলাম "বুদ্ধং শরণং" নামে কথিকাটী। উদ্দেশ্য—তৎকালীন সমগ্র বৌদ্ধ-জগতের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত, অমিতজ্ঞানী, অসীমনির্ভীক হিউয়েন সাঙের সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন আত্মাটীকে আবাহন করে তাকে পাঠকবর্গের সমুখে জীবন্ত করে তোলা।

অন্যদিকেও তাঁর জীবনী ও ভ্রমণকাহিনীর আকর্ষণ কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর পদব্রজে ভারত-অভিযান—উপন্যাসের থেকেও কৌতূহলোদ্দীপক। বিচিত্র ঘটনার সমন্বয়ে তাঁর জীবন গরীয়ান। তাঁর জীবনদর্শন একটী সুন্দর পবিত্র জীবনবোধের জ্বলন্ত নিদর্শন। আমার বার বার মনে হয়েছে এ ধরণের জীবনাদর্শ এখনকার কালের পাঠকদের সমুখে তুলে ধরার একটা বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে।

'বুদ্ধং শরণং'—শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬১ সালের ভাদ্র পর্যন্ত। এই নিবন্ধটীর পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপই হল 'চীন থেকে ভারত'। স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই রচনাটীর মধ্যে অনবধানজনিত বহু ত্রুটী রয়ে গেল। সহৃদয় পাঠকের কাছে তাই আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। তবে যে উদ্দেশ্যে আমার এই গ্রন্থ রচনা—সেই হিউয়েন-সাঙ যদি তাঁর চরিত্রের সমগ্র গুণালোকে পাঠকের সমুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন তবেই জানব শ্রম সার্থক।

এই গ্রন্থটী আমার পক্ষে কোনদিনই প্রকাশ করা সম্ভব হত না যদি না শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়—এক কথায় তাঁর গল্প-ভারতীতে একে

গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে আমার যে ঋণ তা পরিশোধ করবার ধৃষ্টতাও আমার নেই আর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমি রাখি না। অনেক সময় ঋণের অর্থই যাত্রীর পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। এই ঋণকেও আমি আমার সাহিত্যিক জীবন-পথের পাথেয় বলে মনে করি।

'গল্প-ভারতী'র শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কাছেও আমি এ ব্যাপারে অশেষ ঋণী।

আরও একজনের সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশ হত কিনা সন্দেহ। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য অতি সাংঘাতিক লোক—পুরানো মাসিকের পাতা ঘেঁটে যে লোক লেখক খুঁজে বার করেন—তাঁর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা একরকম অসম্ভব বৈকি। তাঁর স্নেহ ও প্রীতিকে শুধু মুখের কথায় ব্যক্ত করলে ভয় হয় হয়তো তাদের ছোট করব।

শ্রীগৌতম সেনকে এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত-কিছু যোগাযোগের সূত্রধার তিনিই।

বিশ্বভারতীর চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ সু-পণ্ডিত থান-উন-শান তাঁর সঙ্গে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করার সুযোগ দিয়ে ও বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সবিশেষ কৃতজ্ঞ করেছেন। অধ্যক্ষ থান-উন-শান ভূমিকাটী চীনা-ভাষায় লিখে দেন এবং তাঁর কন্যা শ্রীমতী তানওয়েন তাকে বাংলায় অনুবাদ করেন। শ্রীমতী তানওয়েনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সহযোগিতার জন্য।

"চীন থেকে ভারত" রচনা করতে আমি যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি সেগুলির তালিকা নীচে দিলাম।

১। M. Stanislas Julien's life and travels of the Chinese Pilgrim Hiuen Tsang. Vol. I & II.

২। Princep's Essays—Vol. I.

৩। Mr. Beal's Budhist Reccord of the Western World —Vol. II.

৪। Pelliot—Bulletin de l' Ecole Frano, eaise d' extreme

৫। Sir Aurel Stein—(i) "The Desert Crossing of Huan-tsang"—T'oung Pao. 1921 2 P. 350.
(ii) Innermost Asia.

৬। Rene Grousset—In the Footsteps of Buddha, 1932.

৭। Percy Sykes—Huan-tsañg's Journey to the land of Buddhism.

৮। M. Foucher—(i) "Notes Sur l' etine'raire de Hiuan-tsang en Afghanistan"—In Etu des asiatique Pour le 25e^{e} anniversaire de l' Ecole Fran caise d' Extreme Orient. (1925). i, P. 257-84.
(ii) "Notes Sur la Geographie ancienne du Gandhara, Commentaire a' un Chapitre de Hiuan-tsang"—Bulletin de l' Ecole Fran,caise de Extreme Orient. (1952). i, 1901, P. 322-9.

৯। Journal of the Royal Asiatic Society—N. S. Vol. IV.

১০। Purna Chandra Mukherji—Antiquities in the Tarai Nepal, the region of Kapila-Vastu—Journal of the Royal Asiatic Socy of Bengal. 1914. P. 391, 751.

১১। Vincent Smith—Early History of India.

১২। Watters—Yuan Chwang.

১৩। বুদ্ধ-চরিত—অশ্ব ঘোষ।

১৪। Bigandet—Life and Legend of Gaudama.

১৫। ললিতবিস্তর—রামদাস সেন
" —রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৬। মহাসুত্ত পিটক—দীঘ্ঘনিকায়—মহাপরিনির্বাণসুত্তম্
—ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

১৭। ধর্মপদম্—হরিহরানন্দ আরণ্যক।

১৮। মঝ্ঝি মণিকায়।

১৯। অভিধম্ম পিটক।

২০। মহবেগ্‌গো।

দূরত্ব বোঝাবার জন্য এই গ্রন্থে 'লী' এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা চীন দেশের মাপ। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণকাহিনী থেকে এটা সরাসরি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এক 'লী'তে ৬২৪ গজ।

ললিতবিস্তর ও ত্রিপিটকের সুন্দর শ্লোকগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করার ও শ্লোকগুলিকে যথাযথ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। যদি কারও মনে হয় এগুলি অবান্তর—তবে তিনি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

অলমিতি—

বুদ্ধ-পূর্ণিমা, ১৩৬৪,
কলিকাতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

এক

বহুদিন পূর্বেকার কথা বলতে বসেছি। সে অনেকদিন আগেকার কথা। একশ…দু'শ—পাঁচশ—হাজার বছরেরও নয়। আজকের দিন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। আমাদের এই ভারতের প্রাচীনকালের কথা।

আর্যরা সিন্ধু উপত্যকায় সবার আগে প্রচার করেন বৈদিক-ধর্ম। এই বৈদিকযুগের পরবর্তী যুগ হল বর্ণাশ্রমধর্ম—বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যুগ। সুতরাং বৈদিকধর্মের পরই ভারতের সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম হল এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোড়াপত্তন যে কবে হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের ভিতর বিস্তর মাথাঘামা-ঘামির ব্যাপার আছে বটে—তবে নিঃসঙ্কোচে এটা বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম হল ভারতের বহু প্রাচীন ধর্ম। একটা জিনিষ বহু দিন ধরে বহু ব্যবহারের ফলে যেমন মলিন হয়ে যায় তেমনি এই ব্রাহ্মণ্যধর্মেও মাঝে মাঝে বহু মালিন্য দেখা দিয়েছে তার স্বাভাবিক নিয়মে। তারই জন্যে সময়ে সময়ে এসেছে নানারকম সামাজিক অশান্তি, যার নিরসন করার প্রয়োজন প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেছেন মনে প্রাণে।

এই রকম এক সামাজিক দুর্দশায় আমাদের সমাজ যখন প্রায় অচল হয়ে উঠেছে তখন 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'

আর ধর্মকে নতুন করে সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের কোলে কপিলাবাস্তুতে জন্ম নিলেন মহাপুরুষ শাক্যসিংহ। তিনি মানুষকে জানালেন যে জরা-মরণ বিধ্বস্ত জীবনেও মানুষ ইচ্ছা করলে বহাতে পারে শান্তির স্বচ্ছ ধারা। তিনি বোধি বা পরাজ্ঞান লাভ করে মানুষকে দেখালেন চিরনির্বাণের পথ—যে পথে গেলে আর 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' তিনি বললেন, অর্হত্ব লাভ বা জগতের সর্বরকম মায়ামোহের বন্ধন কাটিয়ে চীরধারী সন্ন্যাসই হল সংসার ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়। জগৎকে শান্তির এই পথ দেখিয়ে তিনি হলেন—তথাগত-বুদ্ধ।

ভগবান বুদ্ধের জীবন কালের মধ্যেই তাঁর এই সদ্ধর্ম মহা-ভারতের বুকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন মগধ হল এখনকার পাটনা জেলা। তার রাজধানী তখন ছিল রাজগৃহ—বর্তমান রাজগীর। সেখানে তখন রাজত্ব করতেন হর্যঙ্ককুলোদ্ভব মহাপরাক্রমশালী মহারাজ বিম্বিসার। তিনিই সর্বপ্রথম হলেন বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের এবং অহিংসা মন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষক। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মগধবাসী তো বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলই উপরন্তু গঙ্গার অপর পারে বৈশালী রাজ্য—সেখানেও কয়েক বছরের মধ্যেই এই ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে শাক্যমুনির পায়ের নীচে মাথা পেতে দিল অবন্তী, বৎস্য ও কোশল। প্রাচীন অবন্তী হল এখনকার মধ্য-ভারতের 'মালব। কোশল—বর্তমান অযোধ্যাপ্রদেশ, আর বৎস্য রাজ্য হল এলাহাবাদ ও তার কাছে-পিঠের জায়গাগুলো। এদেশগুলির রাজন্যবর্গ সবাই হলেন বুদ্ধের সদ্ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আর এমনি করেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের খানিকটা অংশ জুড়ে রাজধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পরেও সে ধর্মের প্রভাব কিছুমাত্র তো কমলই না বরঞ্চ তা দিন দিন বাড়তে বাড়তে ভারতের অসংখ্য

নদ-নদী-পর্বত-প্রান্তর ডিঙ্গিয়ে হিমালয়ের বাধা ভেদ করে, ভারতসাগর পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেমন করে তা সম্ভব হল সেকথা বলছি।

মগধ ছিল তখনকার দিনে বৌদ্ধধর্মের পুণ্য পীঠস্থান। সেখানে মহারাজ বিম্বিসার বহু অর্থব্যয় করে চারদিকে বুদ্ধের বাণীকে সফল করে তুলতে লাগলেন। দিকে দিকে তৈরী হল মঠ—বিহার—সংঘারাম। দলে দলে শ্রমণরা রাজার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্যে।

কিন্তু বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন যেমন ক্রূর তেমনি নিষ্ঠুর। বুদ্ধের মৈত্রীকরুণার বাণী তাঁর মনে কোনদিন কোন রেখাপাত করতে পারেনি। বিম্বিসার বৃদ্ধ হতেই অজাশত্রু তাঁকে বন্দী করে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে নির্বাসন দিলেন। আর রাজ্যে বজ্র কণ্ঠে আদেশ দিলেন—

বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার
এই কটি কথা জেনো মনে সার
ভুলিলে বিপদ হবে।

কিন্তু অজাতশত্রুর জীবনের কটা বছর—মহাকালের দরবারে কি তার মূল্য।

অজাতশত্রু গেলেন—অত্যাচার, কুশাসন অবলুপ্ত হল। তাঁর পুত্র উদয়ীভদ্র গেলেন। আরও কত রাজাই যে গেলেন তার অবশ্য সঠিক খোঁজ আজও কেউ পাননি।

তারপর মগধের রাজপাটে এসে বসল শিশুনাগ বংশ। প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করল কয়েক শ' বছর। তারাও শেষ হয়ে গেল।

এল নন্দ বংশ।

হিমালয় থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজচক্রবর্তী হয়ে তারা রাজত্ব করে গেল। তারপর যারা এল তাদের নাম মৌর্য। এই মৌর্য বংশের ইতিহাস এক দিন সারা ভারতের ইতিহাস হয়ে উঠল রাজচক্রবর্তী অশোকের অভ্যুদয়ে।

এত রাজবংশের উত্থান পতন হয়ে গেল—এদিকে বুদ্ধের দেহত্যাগের পরও প্রায় তিনশ' বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কত রাজা এল, কত রাজা গেল—কিন্তু বুদ্ধের সেই শান্তিময়ী মৈত্রীকরুণার বাণী কালের কপালে রাজটীকার মতো আঁকা হয়ে রইল। সেই টীকা একদিন মণিমুকুটের রূপে জ্বলে উঠল সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।

বুদ্ধের অপার করুণায় 'চণ্ডাশোক' হলেন 'ধর্মাশোক'। তখন পাটলী-পুত্রের প্রবল প্রতাপে উত্তরে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে হিন্দুকুশ, দক্ষিণে মহীশূর, আর পূবপশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র থেকে আরবসাগর পর্যন্ত এক রাষ্ট্রের বন্ধনে বাঁধা। চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হয়ে বুদ্ধের অহিংসামন্ত্রকে করলেন জপমালা। তিনি ধর্ম ও নীতি প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করলেন দলে দলে কর্মচারীদের। তাদের নাম দেওয়া হল ধর্মমহামাত্য। মহাপ্রাণ অশোক জেনেছিলেন—মানুষ চিরকাল থাকবে না। সুতরাং এই রাজ্যও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সব কিছু নশ্বরতার মধ্যেও তিনি অমর করে রাখতে চাইলেন নীতি ও ধর্মের উপদেশাবলী। বহু স্তূপ তৈরী করালেন তিনি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে শিলালিপির ভাষায় রূপ দিলেন বুদ্ধের বাণীকে। তাঁর নিজের ছেলে মহেন্দ্র আর মেয়ে সংঘমিত্রাকে পাঠালেন তাম্রপর্ণী—বর্তমান সিংহলে—ধর্ম প্রচারের জন্যে।

দুজন দূত গেল সুদূর ব্রহ্মদেশে সাগর পার হয়ে। অশোক মৈত্রীদূত পাঠালেন—মধ্য এশিয়ায় সিরিয়ার রাজ দরবারে, মিশরে, গ্রীসে, উত্তর আফ্রিকায়। তাঁর প্রচেষ্টায়, তাঁরই অক্লান্ত প্রচার কার্যের

ফলে, আজও পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ লোক বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই যতদিন বৌদ্ধধর্ম বেঁচে থাকবে গৌতমবুদ্ধের নামের সঙ্গে বেঁচে থাকবে মহামতি অশোকের নাম। তিনি হলেন চিরঞ্জীব রাজর্ষি।

এত যে বিখ্যাত আর সুদৃঢ় মৌর্যবংশ, তারও একদিন পতন হল। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মের আদর দিন দিন বেড়েই চলল। গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়িয়ে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্র হল উত্তর ভারত। ধর্মাচার্যনাগসেন পাঞ্জাবের অধিপতি গ্রীক মিরাণ্ডারকে দিলেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা।

হিন্দুকুশ পার হয়ে শক্, হুন. পহ্লব প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার যযাবর জাতিরা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে ভারতে আসে ও কিছুকাল রাজত্বও করে। তারপর আসে মধ্য এশিয়ার কুষাণরা। এই কুষাণদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা হলেন মহারাজ কনিষ্ক। এঁর বাহুবলে মধ্য এশিয়ার ইরান, তুরান থেকে সুরু করে পূর্বতুর্কীস্তানের খাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান, এমন কী চীনদেশের কতকটাও তাঁর রাজত্বের মধ্যে ছিল। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল মধ্যএশিয়া থেকে বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই কনিষ্কের সময়ে হিমালয়ের প্রকৃত বাধা এড়িয়ে ভারতবাসী মধ্য-এশিয়াবাসীদের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে গেল। মহারাজ কনিষ্ক ছিলেন অশোকের মতো বৌদ্ধধর্মের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক। কাজেই তাঁরই সময়ে ভারতীয় শ্রমণরা মধ্য-এশিয়ায় বিহার, সংঘারাম প্রভৃতি তৈরী করে দারুণ মরুভূমির দেশেও বুদ্ধের বাণী পৌঁছে দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর—এখনকার পেশোয়ার। সে সময়ে সারা ছুনিয়ায় মাত্র ছুটী বড় ধর্মপ্রচলিত। এই ছুটী ধর্মেরই জন্মস্থান হল ভারতবর্ষ। এর একটীহিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্ম—আর অপরটী বৌদ্ধ ধর্ম। যিশু তখন

সবেমাত্র শিশু, আর মোহম্মদের জন্ম হয়েছিল তার গোটা পাঁচশ বছর পরে।

তখন আফগানিস্থানের নাম ছিল গান্ধার দেশ। আজ আমরা যাদের বলি কাবুলীওয়ালা তারাই হল ভারতে আদিম আর্য জাতির মূলশাখা। কনিষ্কের সময়ে এই গান্ধাররাজ্য সবরকমে উন্নত হয়ে উঠল। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতকলায় পৃথিবীতে ভারতের যে স্থান তাতে গান্ধার সভ্যতার দান যে অনেকখানি—একথা আমরা আজ ভুলে গেলেও, গান্ধারে বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন পুরুষপুরের বিরাট স্তূপ, কাবুলনদীর ধারে খাইবারপাশ আর বামিয়ানের মাঝখানে খিস্তাতোপ, বামিয়ানের প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি, আমাদের সেই সব পুরানো কথা আজও মনে করিয়ে দিচ্ছে। গান্ধারের এসব শিল্পের বেশীর ভাগই তৈরী হয়েছিল মহারাজ কনিষ্কের সময়ে।

কনিষ্কের কিছুদিন আগেই বৌদ্ধধর্মে দুটো ভাগ হয়ে যায়—মহাযান আর হীনযান। কনিষ্ক এইমতের বিরোধ দূর করতে বৌদ্ধ-মহাসম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সভায় মহাযান মতের বিশেষ সমর্থন হওয়ায় আবার নতুন উৎসাহে দিকে দিকে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সুরু হয়। কাশ্মীর, গান্ধার আর তার চারপাশের জায়গাগুলি তখন ছিল মহাযান মতবাদের কেন্দ্র। সেখান থেকে মহাযান শ্রমণরা বেরিয়ে পড়লেন দলে দলে মধ্য-এশিয়ার নানান দেশে। পামীরের উপত্যকা ডিঙ্গিয়ে, হিন্দুকুশ—আলতাই—কারাকোরাম পার হয়ে, গোবি আর তাকলামাকান মরুভূমির ভীষণ কষ্টকে অগ্রাহ্য করে—আমুদরিয়া—শিরদরিয়ার জলে পাড়ি দিয়ে—এইসব বৌদ্ধশ্রমণরা ধর্ম প্রচার করলেন—বামিয়ান, হাদ্দা, বেগরাম, ফুণ্ডুকীস্থান, কুচা, তুরফান, খাসগড় ও পারস্যের ভিতর দিয়ে পশ্চিমে সুদূর রোমক সাম্রাজ্যে—আর পূর্বে চীন দেশে।

চীন দেশে সঠিক কবে যে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয় তা অবশ্য জানা যায়নি বটে, তবে খৃষ্ট জন্মাবার অনেক আগেই যে সেখানে বৌদ্ধ প্রচারকরা যাতায়াত করতেন তার বহু প্রমাণ আছে।

৬৭ খৃঃ চীনের সম্রাট মীঙ-টী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরই রাজত্বকালে কাশ্যপ, মাতঙ্গ আর ধর্মরত্ন নামে পণ্ডিতেরা চীনে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় তর্জমা করতে আরম্ভ করেন।

দুই

প্রাচীন ভারতের প্রায় সাতশ' বছর এক নিশ্বাসে ঘুরে আসা হল। তাতে করে দেখা গেল, কত রাজবংশের উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে কেমন করে বৌদ্ধধর্ম ভারতের জন-সাধারণের ধর্ম হয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল ভারতের বাইরে, আর শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল চীন দেশে।

চীনের প্রাচীন ধর্ম ছিল কনফুসিয়াসের ধর্ম। সে ধর্মবাদ একটু একটু করে নিষ্প্রভ হতে লাগল চীনের জনসাধারণের মধ্যে —বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল প্রভাবে। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম পাকাপাকি ভাবে মহাচীনের জন-সাধারণের ধর্ম হয়ে গেল।

এরও প্রায় দু শতাব্দী পরে হল আমাদের গল্পের সুরু। চীনদেশের মধ্যে এখন যে জায়গাটার নাম হল হো-নান্-ফু—প্রাচীন কালে তার নাম ছিল লো-ইয়াং। তখনকার দিনে লো-ইয়াংএর খ্যাতি ছিল ইতিহাসবিদিত। খৃষ্টীয় সাত শতকের গোড়ার দিকে এখানে বাস করতেন এক অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত চীনা পরিবার। এই পরিবারের ধর্ম তখনকার কালে প্রচলিত ধর্ম অনুযায়ী ছিল কন্‌ফুসিয়াসের ধর্ম। কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মের গোড়ার কথাই ছিল উচ্চাঙ্গের শীলতা ও সৌন্দর্যবোধ। তাছাড়া উদার সমাজ চেতনাও কন্‌ফুসিয়াস ঐতিহ্যের একটা প্রধান অঙ্গ। লো-ইয়াং অঞ্চলে এই পরিবারটীর ধার্মিক ও উদার বলে খ্যাতি তো ছিলই উপরন্তু এঁদের বিদ্যানুশীলনের ধারা এঁদের বংশ মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল হাজার গুণে।

এই প্রসিদ্ধ পরিবারে ৬০২ খৃষ্টাব্দের এক পুণ্যদিনে শুভলগ্নে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল। সেই দিনই বোধ হয় সেই দিব্য জ্যোতিষ্মান শিশুর

প্রশান্ত ললাটে সবার অগোচরে লেখা হয়ে গিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। এই শিশুটীই হলেন হিউ-য়েন্-সাঙ—পরবর্তীকালে যিনি সমগ্র প্রাচ্য দেশের মধ্যে খ্যাত হয়েছিলেনএকজন শাস্ত্রবিদ্, জ্ঞান-তপস্বী ও প্রসিদ্ধ পর্যটক রূপে। পরবর্তী জীবনে সাঙ হয়েছিলেন বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ও মহাচীনের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত।

পরিবারের সনাতন ঐতিহ্যের মধ্যে বাড়তে লাগলেন সাঙ। তাঁর বয়সের এক একটী বছর পার হতে লাগল—আর সবাই দেখতে লাগল সেই বালক বয়সেই কেমন করে সাঙের বুদ্ধিচেতনা স্তরের পর স্তর পার হয়ে একটী শতদল পদ্মের মতো ফুটে উঠছে। পরিবারের প্রতিটি প্রাণী গভীর বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন, সেই বালকের দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে যেন আবির্ভূত হচ্ছেন—এক দিব্য জ্ঞানী প্রবীণ। সে প্রবীণের সহজাত প্রতিভা আর অনন্যসাধারণ ধী-শক্তির প্রকাশ যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হতে লাগল, তেমনি সহজেই বাড়তে লাগল তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। সাঙের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁর বড় ভাই বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করে বৌদ্ধ হলেন। বড় ভায়ের গলায় 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রের পাঠ—সেই বয়সেই সাঙের মনে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জাগিয়ে দিল এক বিরাট কৌতূহল। সেই সময়েই তাঁর পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন তাঁকে বড় হয়ে গ্রহণ করতে হবে বুদ্ধেব মৈত্রীকরুণার মন্ত্রকে জীবনের সার করে।

শিশুর শরীরে প্রবীণের মাথা—বাপ মায়ের মনে একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁরা ভাবলেন, কে এ স্বর্গের দূত—একে আমরা রাখব কোথায়? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝখানে একে রেখে হয়তো বা অজান্তেই ঘটবে কোন ক্রটী। প্রত্যবায়ের সীমা থাকবে না তাহলে। এই মনে করে সাঙের পিতা তাঁকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন লো-ইয়াংএর চিং-তু-স্যুর বৌদ্ধবিহারে। তাঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন। এই বিহারই ছিল

বালকের উপযুক্ত স্থান। বিহারের সংঘস্থবিররা বালককে দেখে মুগ্ধ হলেন। জ্যোতির্ময় বালকের সারা অবয়ব ছাপিয়ে যেন ঠিকরে বার হচ্ছে প্রতিভার তীব্র দ্যুতি। শান্ত সৌম্য ভাবের সঙ্গে মুখে চোখে যেন এক আধ্যাত্মিক আলোর রেখা ঝলক দিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানী স্থবিররা বুঝলেন যে, এ বালক যে সে নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা বিরাট মহিমা। একে দিয়ে তথাগত তাঁর পরম এক ইচ্ছাকে হয়তো সফল করে তুলতে চান। সংঘস্থবিরদের যিনি প্রধান, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে—সেই অল্প বয়স্ক কিশোরকেই পরম আগ্রহে স্থান দিলেন বিহারে। সাঙের বয়স তখন মাত্র তেরো বছর।

সেখানে তথাগতের উপাসনার মধ্যে—গম্ভীর স্তব গাথার সঙ্গীতে, সাঙ খুঁজে পেলেন এক পরম আলোকময় পথের ইঙ্গিত। সেই বয়সেই তিনি সংঘস্থবিরদের কাছে গভীর মনঃশীলতার সঙ্গে পাঠ নিতে লাগলেন—ভারতীয় দর্শনের। অধ্যয়নের ভিতর সাঙ সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে বিসর্জন দিলেন। ভেদ রাখলেন না মহাযান আর হীনযানে। তিনি সমান আগ্রহ আর জিজ্ঞাসা নিয়ে পড়তে লাগলেন—দুই সম্প্রদায়েরই ধর্মমত। তিনি হীনযান প্রত্যক্ষ-বাদীদের অভিধর্মকোষশাস্ত্র পাঠ করলেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাযানের অতি সূক্ষ্ম তত্বে ভরা, যোগ ও ধ্যান-ধারণায় আত্মার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের তত্বগুলিতে তাঁর মন বসে গেল। গভীর তৃষ্ণা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন নিব্বাণ সূত্ত। তাতে তিনি নির্দেশ পেলেন কেমন করে যোগারূঢ় হয়ে এই পার্থিব সমস্ত কিছুর সীমা ছাড়িয়ে সেই অবাঙ্-মানসগোচর, আনন্দময় লোকে পাড়ি দেওয়া যায়।' সংগে সংগে মনের সকল জড়তা ও অন্ধকার দূর করে যে পথ মানব মনকে পরিশুদ্ধ-জ্ঞানের রাজত্বে নিয়ে যায়—সে পথেরও সন্ধান তিনি পেয়ে গেলেন মহাযান-সংপরিগ্রহ শাস্ত্র পাঠ করে।

এইভাবে সাঙ দিনের পর দিন বৌদ্ধভিক্ষুদের সাহচর্যে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে লাগলেন শ্রমণের জীবন বেদ।

* * *

চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বারে বারে মহাচীনের ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার অন্তর্দ্বন্দ্বে, সেই কোন এক ভুলে যাওয়া অতীত কাল থেকে। এ দ্বন্দ্বের শেষ হয়েছে মাত্র এই সেদিন—মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয়ের পর।

৬১৮ খৃষ্টাব্দে এমনি এক অন্তর্বিপ্লব সুরু হয়েছিল সারা চীন দেশ জুড়ে। এ ছিল তখনকার অত্যাচারী, কুশাসক হান্ রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ। একদিকে রাজশক্তির প্রবল স্বৈরাচার। অপর দিকে প্রজাদের সংবদ্ধ বিদ্রোহ। এই দুয়ের মাঝে পড়ে মহাচীনের অবস্থা তখন ঘোরতর শোচনীয়। প্রজাদের নেতৃত্ব করছিলেন মহাবীর ও সর্বজনপ্রিয় নেতা তাই-সুং।

রাজদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল দিকে দিকে। রাজার সৈন্যরাও নির্বিচারে নিরীহ প্রজাদের মাথা কাটতে লাগল নিষ্ঠুর তলোয়ারের আঘাতে। চলতে লাগল নৃশংস মারামারি, কাটা-কাটি—রক্তপাত। অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত চীনের জনসাধারণ ভুলে গেল বুদ্ধের বাণী। মহাচীনের সে এক দারুণ দুর্দিন। যেন এক চাঁই জমাট বাঁধা অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল সোনার চীনকে। চীনের লোকের মুখে নেই হাসি, প্রাণে নেই স্ফূর্তি। সর্বদা ভয় প্রাণ হারানোর।

এক এক জায়গায় মারামারি এত বেশী হয় যে, সেখানকার শান্তিপ্রিয় গৃহস্থেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে পালায় জংগলে। কোথাও বা চলে আগুনে পোড়ানোর ব্যাপার। গৃহস্থেরা পড়ল বিপদে। সাধুরা

গণলেন প্রমাদ। সকলেরই হলএক চিন্তা, কেমন করে এই মহা বিপদের সমুদ্র পার হবে।

সমগ্র চীনের যখন এই অবস্থা তখন উত্তর চীনের লো-ইয়াংএতেও সে আগুনের হল্‌কা এসে পড়তে বেশী দেরী লাগল না। একদিন হঠাৎ সেখানে সুরু হয়ে গেল বিষম মারামারি কাটাকাটি। ঘরের পর ঘর জ্বলে উঠল আগুনের শিখায়। অসহায় গ্রামবাসীদের অনেকে মারা পড়ল তলোয়ারের নিষ্ঠুর ঘায়ে। কতক কতক বা পালিয়ে বাঁচল। হিউ·য়েন-সাঙ তখন ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর। এই দারুণ দুর্যোগের দিনে একরাতে সাঙ আর তার ভাই অন্ধকারের মধ্যে ছাড়ল লো-ইয়াংএর বৌদ্ধ-বিহার। জন্মস্থান লো-ইয়াং, চির-পরিচিত লো-ইয়াং। কত সুখ-দুঃখ-বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত লো-ইয়াং। লো-ইয়াং ছাড়তে দুভায়ের বুক ফেটে গেল। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়। পালানো ছাড়া আর নান্যঃ পন্থা। সুতরাং তারা দুভায়ে লুকিয়ে পালিয়ে আসতে লাগল লোকচক্ষুর অগোচরে। আহার নেই, নিদ্রা নেই। পানীয় কেবল নদীর জল। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে দুভায়ে একদিন এসে হাজির হল সু-চুয়াং-এর পর্বত ঘেরা উপত্যকায়।

সু-চুয়াং এর রাজধানী চেং-তু হল ছোট্ট একটা পাহাড়ে জায়গা। যদিও এর অবস্থান চীনের মধ্যেই তবুও চারদিকে পাহাড়ের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে সে যেন একান্ত বিচ্ছিন্ন—একলা। এই একলা হওয়ার জন্যেই বোধ হয় চীনের বিপ্লবের আগুন সারা চীনদেশকে পুড়িয়ে চেং-তু তে তখনও এসে পৌছাতে পারেনি। সেখানকার আবহাওয়া তাই অনেক শান্ত। পাহাড়ে-ঘেরা চেং-তু তে ছিল তখনকার দিনের বহুবিখ্যাত বিরাট সংঘারাম। সাঙ দেখল সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন সারা চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা যত বৌদ্ধভিক্ষু আর শ্রমণরা। এঁরা চীনের

এই বিপ্লবের জন্য মনে মনে সবাই খুবই শঙ্কিত। ভগবান তথাগতের অহিংসা মন্ত্রের অবমাননায় দারুণ ক্ষুব্ধ। তাঁরা মনে প্রাণে ডাকেন তথাগতকে। প্রার্থনা করেন বিপ্লবের অবসান। আর দেশব্যাপী এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পাঠ করেন পাতিমোক্ষ।

চেং-তুর কুং-হুই-সু সংঘারামে সাঙ আর তার ভাই এসে আশ্রয় চাইল। সংঘমহাস্থবির অবাক বিস্ময়ে দেখলেন কিশোরের ললাটে অপার্থিব দিব্যজ্যোতি, মুখে চোখে বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ দীপ্তি। তিনি সাদরে তাদের স্থান দিলেন। এই সংঘারামে এসে সাঙের মন দিনকতক বেশ খারাপ হয়ে রইল। পিছনে ফেলে আসা, আবাল্যের আশ্রয় নীড়, চির পরিচিত লো-ইয়াংএর জন্যে। সংঘের স্থবির মহাস্থবিররা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। জানালেন জগতের সবই হল নশ্বর। একদিন না একদিন সব কিছুকে ধ্বংস হতেই হবে। তবে কেন বৃথা এই মায়ার বন্ধন। জীব মাত্রেরই উচিত বোধিসত্ত্বের বাণীকে অনুসরণ করে নির্বাণের পথকে প্রশস্ত করা। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই তার মনের গ্লানি কেটে গেল। বুদ্ধের জীবনী আর বাণী ষোড়শ বর্ষীয় কিশোরের মনে কী একটা তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলল। সাঙ ভাবল, জানতে হবে এই অজানা রহস্যকে, কেমন করে মানুষ নিষ্কৃতি পায় এই জাগতিক জরা-মরণ-ব্যাধির জ্বালা থেকে। তিনি সেদিন থেকে আরম্ভ করলেন কঠিনতর অধ্যয়ন। তীব্র পাঠানুরাগ ছিল তাঁর আবাল্য। এবার জগতের যাবতীয় বাহ্যিক চিন্তা তাঁর মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।

বয়স মাত্র ষোল বছর। যে বয়সে ছেলেরা খেলার মাঠে ভীড় করে—চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। নানা-রকমের দুষ্টুফন্দি মাথায় গজায় প্রতিবেশী কিম্বা অভিভাবকদের জ্বালাতন করার জন্যে। সেই বয়সে হিউ-য়েন-সাঙ সংঘ-মহাস্থবিরের কাছে

বসে অধ্যয়ন করতে লাগলেন যাবতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র। এই ভাবে সাঙ ধীরে ধীরে ডুবতে লাগলেন জ্ঞান সমুদ্রের অতলগভীরে।

* * *

এই ভাবে স্থ-চুয়াংএর উপত্যকার সংঘারামের মধ্যে সেই কিশোরের জীবনে আরও চারটী বসন্ত যে কেমন করে এল আর চলে গেল, কেমন করে কিশোর হল পূর্ণবয়স্ক যুবক, তা বোধ হয় সাঙ নিজেও জানতে পারলেন না। তখন তিনি একান্ত মনোযোগে গাঁথছিলেন তাঁর জ্ঞান-সৌধ। আর সেই বিস্তীর্ণ জ্ঞানরাশি একত্র করে লিখছিলেন তাঁর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার গ্রন্থ—বিজ্ঞপ্তি মাত্রতাসিদ্ধি। এদিকে বাইরের জগতে যে কত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল তার খবর তিনি কিছুই রাখতেন না। অকস্মাৎ দীর্ঘ চার বছর পরে তাঁর সেই গভীর তপস্যা ভাঙ্লো। তিনি পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি দেখলেন চীনের সেই সর্বগ্রাসী বিপ্লবের হয়েছে অবসান। অত্যাচারী কুশাসক হান্-রাজবংশের হয়েছে সমূলে উচ্ছেদ। আর সবেমাত্র গোড়া-পত্তন হয়েছে চীনের সুপ্রাচীন তান্-রাজবংশের। সে বংশের প্রথম রাজা হয়েছেন বীর যোদ্ধা তাই-সুং। চীনে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। তাই-সুং তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছেন চাং-আন্ সহরে। চাং-আন্এর বর্তমান নাম হল সি-আন্-ফু।

চাং-আনের নাম ডাক তখন প্রচুর। একে রাজধানী তায় আবার প্রকাণ্ড সহর। শুধু তাই নয়। এই চাং-আনে কিছুকাল আগে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশ্রমণরা এসে স্থাপন করেছেন এক সংঘারাম। যে সংঘারামের মতো বিরাট বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান তখন চীনদেশে আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ। সেই সংঘরামে বাস করতেন বহু সহস্র

শ্রমণ আর জ্ঞানবৃদ্ধ স্থবির মহাস্থবিররা। সেখানে ছিল বহু ভাষায় তর্জমা করা বৌদ্ধধর্মের নানা বিষয়ের উপর রচিত বহু পুঁথি।

এদিকে সাঙের বয়স হয়েছে কুড়ি বছর। তখন ৬২২ খৃষ্টাব্দ। বৌদ্ধ-শাস্ত্র অনুসারে অর্হত্বে দীক্ষা নেবার এই হল প্রকৃষ্ট সময়। তিনি আর দেরী করলেন না। সংঘের মহাস্থবিরের কাছে থেকে গ্রহণ করলেন উপসম্পদা। অঙ্গে নিলেন ক্ষৌমবাস—বুকে ধরলেন জীবের প্রতি অসীম করুণা, ক্ষমা আর তিতিক্ষা—কণ্ঠে ধ্যানের মন্ত্র — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

উপসম্পদা গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই তিনি অনুভব করলেন জগতের নশ্বরতা। মার-বিধ্বস্ত, জরা-মরণ-ব্যাধি জর্জরিত এই জগৎকে তিনি একটা বিরাট ফাঁকির খেলা বলে ধরে নিলেন। তিনি বুঝলেন নির্বাণই হল জাগতিক জীবের একমাত্র কাম্য। মনে মনে ঠিক করলেন যে ভগবান বুদ্ধের এই বাণীকে সফল করে তুলতে হবে—পৌঁছে দিতে হবে এই সদ্ধর্মের উপদেশাবলী প্রতিটী মানুষের কাছে সারা জীবন দিয়ে। এই মনে করে একদিন তিনি সংঘের স্থবির আর মহাস্থবিরদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চাং-আন সহরের বিখ্যাত সংঘারামের উদ্দেশে।

চাং-আনের বৌদ্ধবিহারে এসে সাঙ বিশেষ আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতরা আর খাসগড় থেকে আসা শ্রমণরা• এখানকার গ্রন্থাগারে যে অমূল্য জ্ঞানের রসদ সঞ্চিত্ করে রেখে গেছেন তা দেখে তাঁর মন নেচে উঠল। তিনি ভাবলেন নির্মল পরিশুদ্ধ জ্ঞান যাকে সাধুরা বলেন বোধি—তা যদি লাভ করতে হয় তবে এই হল তার পীঠস্থান। তিনি চাং-আনে স্থায়ী বসবাস সুরু করলেন। আর সেই সঙ্গে আবার তাঁর মনকে ডুবিয়ে দিলেন জ্ঞানের গভীর তপস্যায়।

* * * *

আগেই বলেছি যে কুষাণরাজ কনিষ্কের রাজত্বের কিছু পূর্বেই ভারতীয় বৌদ্ধরা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মহাযান আর হীনযান। চীনদেশে এই মহাযান ধর্মই ছিল তখন প্রবল সাঙ নিজে হলেন একজন মহাযান বৌদ্ধ। কিন্তু তাহলে কী হবে—তিনি নিজে ধর্মাধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পাঠ করতে লাগলেন সমস্ত পুঁথি একাগ্র-চিত্তে। খুব বেশী দিন তাঁর মনের এই একাগ্রতা একভাবে রইল না। একদিন তাঁর এই নিরঙ্কুশ অধ্যয়ন তপস্যা ভেঙে গেল—তাঁর নিজেরই কতকগুলি প্রশ্নে। বয়সে যদিও তিনি নবীন যুবক—অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি দেখেছেন অনেক-কিছু। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এইযে এই বয়সেই তিনি হয়েছেন জ্ঞানতপস্বী। প্রজ্ঞার তৃতীয় নেত্র তাঁর ললাটে তখন অর্দ্ধস্ফুট। এমন সময়ে সাঙের মনে প্রশ্ন উঠল—ভগবান বুদ্ধের বাণী তো সেই এক। জরা মরণ ব্যাধির হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে হলে চাই পরাজ্ঞান যা কিনা মানুষকে নিয়ে যায় সেই মহানির্বাণের পথে। আর জীবের প্রতি কারুণ্য ও প্রেম-প্রীতিই হল জাগতিক জীবের একমাত্র পাথেয়। এ কথার তো হেরফের কিছুই নেই। তবু এই সদ্ধর্মের মধ্যে কেন এই ভাগ? কেন এই সাম্প্রদায়িক কলহ? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হিউ-য়েন-সাঙ চাং-আনের বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে করলেন আলোচনা ও বিতর্ক। কিন্তু তাতে চিত্তের দ্বিধা মেটে কই? চীনের বৌদ্ধরা সবাই মহাযান। কাজেই বিতর্কের মধ্যে আপন সম্প্রদায়ের জন্য পণ্ডিতদের মনেও দেখা যায় দুর্বলতা। আলোচনায় থেকে যায় বিরাট ফাঁক। দ্বিধাগ্রস্ত সাঙ পুঁথির পর পুঁথি শেষ করতে লাগলেন মনের মতো উত্তর পেতে। শুধু বৌদ্ধ শাস্ত্রই নয় তিনি পড়তে লাগলেন অন্যান্য ধর্মমতের গ্রন্থাদি তিনি ভাবলেন বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বেদ বেদান্ত উপনিষদ পড়তে হবে। তিনি মনে মনে ঠিকই জেনেছিলেন—যে প্রশ্নের

ধারা তাঁর মনের ভিতর জেগে উঠেছে—তাকে সঠিক উত্তরে তুষ্ট করতে হলে চাই ধর্ম সম্বন্ধে চিত্তের প্রসার।

তাই একদিন তিনি চাং-আনের সংঘারামে পুঁথির স্তূপের ভিতর বসে অনুভব করলেন—যে মাটী থেকে বুদ্ধের জন্ম—সেই মাটির কাছ থেকেই তিনি তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে নেবেন। তিনি তর্ক করবেন ভারতীয় দার্শনিকদের সঙ্গে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সকল বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে। জানবেন তাঁদের অভিমত! কিন্তু এ করা তো সহজ কথা নয়। এর জন্যে প্রয়োজন ভারতের পুণ্যভূমিতে অভিযানের। অবাস্তব, অদ্ভুত কথা! দুঃসাহসেরও তো লোকের সীমা থাকে! তখনকার দিনে এখনকার মতো না ছিল রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, উড়োজাহাজ—কেবলমাত্র পায়ে হাঁটা আর ঘোড়ায় চড়া ছাড়া আর কোন তৃতীয় পন্থার কথা তখনও কোন সভ্য মানুষ কল্পনাও করে নি। তারপর একবার মধ্যএশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে চীনের থেকে ভারতে আসার কথা তখনকার দিনে ছিল কতদূর অসম্ভব। একে তো আছে তুষারমৌলী হিমালয়ের অভ্রভেদী পাঁচিল, তারপর পামীরের মালভূমির ওপারে কারাকোরাম-তিয়ান-সান—আলতায়ের খাড়াই উঁচু বরফে ঢাকা শৃঙ্গশ্রেণী। আর তাদের ঠিক নীচেই ক্ষুধিত রাক্ষসের মতো মুখব্যাদান করে আছে ঊষর গোবি আর মরীচিকাময় তাকলামাকান—যাদের বুকের ওপর দিয়ে টপকে আসতে স্বেন হেডিনের মতো বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের পর্যটক পর্যন্ত পদে পদে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তখনকার কালে এসব ডিঙ্গিয়ে আসা কি সোজা কথা। চীনের অতি সাধারণ লোকের কাছেও মনে হবে একথা একটা বাতুলের প্রলাপ। প্রকৃতির দুর্যোগের কথা ছেড়ে দিলেও আরও যে সব পথের বাধা-বিপত্তি তারাও তো কম নয়। দুস্তর পথের মাঝখানে সর্বদাই ভয় দস্যু তস্করের। আর সবার ওপর হল মধ্য এশিয়ার কোনদিন বশে-

না-আসা, ঘর-ছাড়া, নিষ্ঠুর, যাযাবর জাতেরা—যাদের মুঠোয় পুরতে তাই স্যুং-এর মতন কৌশলী যোদ্ধাও তখন পর্যন্ত পেরে ওঠেননি।

পথের এই সব বাধা-বিপত্তির কথা সাঙ যে জানতেন না তা নয়। কিন্তু কোন কিছুতে ভয় পেয়ে সংকল্প থেকে পিছিয়ে যাবার পাত্রই তিনি ছিলেন না। এদিক থেকে তাঁর মন ছিল বজ্রের মতো কঠোর। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যাবার ও সেখানকার বিদগ্ধসমাজের সঙ্গে আলোচনা করে চিত্তের সন্দেহ দূর করবার জন্য তিনি যে কোন কষ্ট—যে কোন বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত। সাঙ তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সংঘের শ্রমণদের কাছে। তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত কয়েকজন শ্রমণ তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে অভিযান করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু মহাচীনের এলাকা পার হতে হলে তো চাই সম্রাটের অনুমতি। তাছাড়াও এই দুঃসাহসিক অভিযানে যে পরিমাণ রসদ দরকার একমাত্র সম্রাটই পারেন তার ব্যয়ভার বইতে। রাজার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছু করা তো সত্যিই অসম্ভব.

ইতিমধ্যে মহাচীনের বৌদ্ধদের মধ্যে সাঙের ব্যুৎপত্তি ও বৈদগ্ধের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৌদ্ধরা তাঁকে সম্মানিত করেছেন—'ধর্মগুরু' উপাধিতে ভূষিত করে। এই সময়ে একদিন তিনি নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে এক আবেদন পাঠালেন সম্রাট তাই-স্যুংএর কাছে। কিন্তু চীনসম্রাট তাং-স্যুং তখনকার দিনের নানাবিধ রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে সাঙের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

সম্রাটের এই নেতিবাচক উত্তরে সাঙের মন নিরাশায় ভরে গেল। তাঁর সঙ্গে যে সব শ্রমণরা অভিযাত্রী হিসেবে যাবার জন্য পূর্বে রাজী হয়েছিলেন—তাঁরাও একে একে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। উদ্বিগ্ন হলেন সাঙ। তিনি ভাবতে লাগলেন—তবে কী তাঁর ভারত যাবার

স্বপ্ন সফল হবে না। ভগবান তথাগতের জন্মভূমি তাঁকে জানিয়েছে এক অশ্রুত আহ্বান—সে আহ্বানে কী তিনি কোন সাড়াই দেবেন না। পরিপূর্ণ হবে না তাঁর অন্তরের এই ঐকান্তিক বাসনা। চাং-আনের সংঘারামের এক নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত অন্ধকারে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এ সকল কথা।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল। সেই বিরাট সংঘারামের সব কোলাহল ক্রমে যেন যাদুকরের ছেঁায়ায় আস্তে আস্তে নিশুতির ভেতর ডুবে গেল। সাঙের চিন্তাতপ্ত চোখ ধীরে ধীরে ঢুলে পড়তে লাগল নরম ঘুমের ছেঁায়ায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন—যেন তিনি চলেছেন এক সুদীর্ঘ পথ ধরে। সে পথ বিলীন হয়ে গেছে সেই দূর দিগন্তে। পরণে তাঁর পর্যটকের বেশ—হাতে ধরা আছে পথ চলার জন্য দণ্ড। ক্রমশঃ তিনি দেখলেন তাঁর চলার পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বিছিয়ে রয়েছে এক সমুদ্র। সহস্র ফেনশীর্ষ সে সাগর উর্মিচঞ্চল। আর সেই সমুদ্রের বুক চিরে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক অভ্রংলিহ পর্বত। সেই পর্বতের গা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ হিমকণায় এক চারু শুভ্র সুষমা বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাঙ বুঝলেন—এই সেই সুমেরু পর্বত। তিনি সুমেরুশীর্ষে পৌছাবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। সেই দেবতাত্মা পর্বতের স্বর্গীয় সুষমা যেন তাঁকে দুর্নিবার আবেগে আকর্ষণ করল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তখনই ভগবান বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ করে ঝাঁপ দিলেন সেই উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে। কিন্তু একি! সাঙ ভাবলেন, এ কি মায়া না এ দেবতার আশীর্বাদ। পায়ের নীচে তাঁর ফুটে উঠল এক বিরাট রক্তকমল। সেই রক্ত-কমলের ওপর তিনি অনায়াসে ভেসে চললেন সমুদ্রের বুকে। ক্রমশঃ সেই রক্তকমল এসে ঠেকল সুমেরু পাহাড়ের তলায়। সাঙ

চেয়ে দেখলেন—অত্যুচ্চ সেই গিরিচূড়ায় যাওয়া যেন মানুষের শক্তির বাইরে। ভাবতে লাগলেন তিনি কেমন করে সুমেরুর শিখরে উঠবেন। এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। সমুদ্রের বুক উঠল দ্বিগুণ ফুঁসে। দিগন্ত শিউরে উঠল প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিবাত্যার দাপটে। সেই ঘূর্ণিবায়ু এক পলকে সাঙকে শুক্‌নো পাতার মতো তুলে নিলো শূন্যে তারপর ফেলে দিল সুমেরুর চূড়ায়। সাঙ দেখলেন সেখান হতে—তাঁর পায়ের নীচে ছড়িয়ে আছে এক বিরাট পৃথিবী।—সাঙের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সাঙ দেখলেন বাইরে আলোর রেখা পরিস্ফুট। ঊষা যেন আজ নতুনরূপে সাঙকে অভিনন্দন জানাচ্ছে দু'হাত বাড়িয়ে। তিনি স্বপ্নের কথা স্মরণ করে প্রাণে পেলেন এক অমিত শক্তি অসীম সাহস। তিনি ভাবলেন—এবার হয় মন্ত্রের সাধন না হয় তো এই ছার শরীরের পতন। তাঁকে ভারতবর্ষে যেতেই হবে—হোক না কেন সে যাওয়ার পথ—ক্ষুরধারের মতো দুর্গম দুরতিক্রম্য। তিনি স্থির করলেন সম্রাটের কোন আদেশ বা সাহায্যের অপেক্ষা আর তিনি করবেন না। সব কিছু ছেড়ে একাই পথে বার হবেন। তাঁর অন্তরে কে যেন আজ ডেকে বলছে—ওঠো, জাগো, শ্রেয়কে লাভ কর।

যেমনই ভাবা অমনি আর দেরী না করে ৬২৯ খৃষ্টাব্দের কোন এক অজানা মাসের অজানা দিনে সেই জ্ঞানতপস্বী শ্রেয় লাভের আশায় নিজেকে ছেড়ে দিলেন মহাচীনের এলাকার বাইরে চিরক্ষুব্ধ গোবি মরুভূমির উত্তপ্ত বালিরাশির মধ্যে।

তিন

মধ্যএশিয়ার প্রায় সমস্তটা জুড়ে আছে কেবল পাহাড় আর মরুভূমি। জনপদের সন্ধান এখানে বিশেষ নেই। যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে কেবল দেখা যায় পাহাড়ের উচ্চাবচ রেখা আর ধূ ধূ মরুভূমি। এই মরুভূমির এলাকাও বড় কম নয়। চীনের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে এর সুরু—আর মাঝখানে দুটো বড় বড় মরুভূমি পার হয়ে পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল এসে খাশগড়ে হয়েছে এর শেষ। এই দুই মরুভূমির পূবেরটার নাম গোবি আর পশ্চিমটার নাম—তাকলা-মাকান। দুটো মরুভূমিই একাধারে ভীষণ দুর্গম আর ভয়ংকর।

এদের আবহাওয়া যেমন শুক্‌নো তেমনি চরম। দিনে একবার রোদ উঠলেই বালির রাশি তেতে লাল হতে থাকে। তারপর পশ্চিমে ঝড়ো হাওয়া বইতে সুরু করলেই একেবারে প্রলয় লেগে যায়। ভৈরবের জটার মতো কটা বালি দুপুরের রোদে আগুনের ফুলকি হয়ে উড়ে বেড়ায়—বাতাসের ঘুর্ণিতে তাণ্ডব নাচ নেচে।

দুপুরে মরুভূমির যে রূপ তা কতো ভয়ংকর সে কথা সহজে কল্পনা করা যায় না। বৃষ্টি এখানে হয় না। কোথাও এর একফোঁটা জলের চিহ্ন মাত্র কেউ দেখতে পাবে না। যদি দৈবাৎ কখনো বৃষ্টি হয়—তবে তৃষ্ণার্ত মরু তার উষর বুকে তখনি তা শুষে নেয়। কোথাও নেই এর একটা গাছ। বিস্তীর্ণ বালির স্তূপের ওপর নেই কোন আচ্ছাদন। একটু ছায়া নেই, মায়া নেই—নিষ্ঠুর, প্রাণঘাতী, মরুভূমি। দুপুরে সূর্যের তাপে এ আরও ভীষণ আরও অসহ্য। এসময়ে চারদিকে এর দেখা যায় মরিচীকা। তাদের মায়ায় পড়লে তৃষ্ণার্ত পথিকের আর রেহাই নেই। একটু একটু করে সে যাবে এগিয়ে জলের আশায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সবকিছু যাবে

শুকিয়ে—কণ্ঠ, তালু, বুকের রক্ত, প্রাণরস। রাত্রে এখানে আবার দারুণ শীত। এতো ঠাণ্ডা যে জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যাবে। দিনের সঙ্গে রাতের তাপমাত্রা একেবারে বিপরীত। শেষরাতে জমে ভয়াবহ কুয়াশা—একহাত দূরের কোন কিছু দেখতে পাওয়া যায় না—এত ঘন, এতো অন্ধকার!

এইরকম রহস্যময় আর প্রাণঘাতী হল মাঝ এশিয়ার মরুভূমি!

হিউ-য়েন-সাঙ কিন্তু সব কিছু জেনেই একমাত্র মনের বলকে সম্বল করে বের হলেন সেই পথে। সঙ্গে প্রাণধারণের সামগ্রী নেই বিশেষ কিছু। কেবল অন্তরে আছে ভগবান বুদ্ধের করুণাময় নাম। এইরকম অবস্থায় যে কোন লোকই মরুভূমির ওপর দিয়ে চলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত লোক ছিলেন হিউ-য়েন-সাঙ্। রাজার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে তিনি পার হয়ে এলেন চীন রাজ্যের সীমানা। সেই জন্যেই সঙ্গে রসদ কিছু আনা একেবারেই সম্ভব হয়নি। আর তা ছাড়া চীরধারী সন্ন্যাসীকে রসদ জোগাবেই বা কে? এতসব ভাববার অবকাশ তিনি তাঁর মনকে দিলেন না—বোধহয় ইচ্ছে করেই। যদি কোন দ্বিধা এসে আবার চলার পথে বাধা দেয়। তিনি তাই আগেই পা চালিয়ে দিলেন। এপারে চীনের এলাকা তারপর বিরাট বালির সমুদ্র পার হলে আছে একটা সহর—তার নাম হামি। তার উদ্দেশেই সাঙ চলেছেন বালির স্তূপ ঘেঁটে।

গোবি মরুভূমির উপর বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে এলে পড়ে মহাচীনের শেষ সীমানা। সেখানে সেই মরুভূমির ওপরেই তখন অবস্থিত ছিল চীন-সম্রাটের বিখ্যাত পঞ্চদুর্গ। এই পাঁচটী দুর্ভেদ্য দুর্গ চীনের সম্রাট তখনকার দিনে তৈরী করিয়েছিলেন মাঝ এশিয়ার বর্বর যাযাবর জাতেরা যাতে চীনের মধ্যে ঢুকে উৎপাত করতে না পারে সেই জন্যে। এই দুর্গ পাঁচটীর প্রধান কাজই ছিল পাহারা দেওয়া। এসব দুর্গের প্রহরী সৈন্যরা সব সময়ে মরুভূমির বুকে ঘোড়া

ছুটিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়াত—সজাগ লক্ষ্য রাখত কখন কোন আগন্তুক যাতে হঠাৎ ঢুকে না পড়ে চীনের মধ্যে। সাঙ মরুভূমির সব কথাই আগে শুনেছিলেন কিন্তু এই প্রহরী সৈন্যদের কথা তিনি একেবারেই জানতেন না। কাজেই সাবধান হবার কথাটাও তিনি মোটেই ভাবেননি।

একদিন মরুভূমির মধ্যে চলতে চলতে তিনি ধরা পড়ে গেলেন—এই রকম একদল প্রহরীর হাতে। তারা সাঙের কাছে সাম্রাটের আদেশপত্র দেখতে চাইল—চীনের এলাকা পার হয়ে যাবার আদেশ-পত্র। কিন্তু সাঙ তো আসছেন পালিয়ে—রাজার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। আদেশপত্র তিনি পাবেন কোথায়? তিনি সেই প্রহরী সৈন্যদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন আর জানালেন তাঁর মহৎ আকাঙ্খার কথা। তিনি বললেন—আমি একজন বৌদ্ধভিক্ষু। চীরবাস আমার অঙ্গের আচ্ছাদন, মুষ্টিভিক্ষা আমার অন্ন আর মহা-নির্বাণের পথই হল আমার চরম কাম্য। তবে ভগবান বুদ্ধের অপার করুণায় আমার জীবন তাঁরই এক মহৎ কাজে আমি অর্পণ করেছি। সেই উদ্দেশ্যেই আপাততঃ আমি চলেছি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে।

সৈন্যরা সবাই জানতে চাইল—কোন অর্থ বা সম্বল না নিয়ে তিনি কোন ভরসায় এই দুস্তর মরুতে পাড়ি দিলেন? উত্তরে সাঙ জানালেন—আমার সহায়, সম্বল সবই হল ভগবান তথাগতের পবিত্র নাম।

সৈন্যরা মুগ্ধ হল। সাঙের পবিত্র সৌম্য মূর্তি আর তাঁর সহজ সুন্দর কথায় তাদের মন ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল সাঙের মনের অলৌকিক শক্তি—যা কিনা কপর্দকহীন অবস্থায় প্রায় রিক্তহস্তে পদব্রজে এই কঠিন পথে পাড়ি দিয়ে চলেছে সমস্ত মারাত্মক বাধার পাহাড় অতিক্রম করে। ঐ

শক্তি দেখে যাদের মন টলে না তারা মানুষ নয়। সৈন্যদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই মিলে ব্যস্ত হয়ে ভাবতে লাগল কেমন করে সাহায্য করা যায় এই সন্ন্যাসীকে। কেউ কেউ তাঁকে মরুভূমির দারুণ কষ্ট আর বাধার কথা শোনাল। জানাল এই সব বালির পাহাড়ের তলায় তলায় কী রকম করে মৃত্যু প্রতীক্ষা করে থাকে পথিকদের জন্য। অনুরোধ করল সাঙকে চীনে ফিরে যাবার। তারা বলল—আপনি হলেন আমাদের মহাচীনের একজন পরম গৌরবের বস্তু। সমগ্র বৌদ্ধধর্মের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন। কেন আপনি একটা অলীক কল্পনার মোহে আপনার অমূল্য জীবন বিসর্জন দেবেন? চীনে তো সহস্র রকম পথ ছিল বুদ্ধের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার। হে শ্রমণ, আপনি ফিরে চলুন। শুনুন আমাদের অনুরোধ।

কিন্তু অনুরোধ বৃথা। সাঙের প্রতিজ্ঞা অটল হয়ে রইল তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠাতে। শেষে সৈন্যরা সাঙকে তাদের যা ছিল তাই দিয়ে সাহায্য করল। তারা তাঁর সঙ্গে দিল একটী সুন্দর ঘোড়া। ঘোড়াটী ছিল একটী অতি নিপুণ বাহন। সে মরুভূমিতে বার পনেরো যাতায়াত করেছে হামির পথে। কাজেই পথ তার চেনা। আর দিল একজন পথপ্রদর্শক। তার ওপর আদেশ রইল সাঙকে নির্বিঘ্নে হামি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার।

কিন্তু সৈন্যদের এতেই হল এক দারুণ ভুল। যে লোকটীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করল তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না সাঙের সঙ্গে যাবার। কী করবে এদিকে ওপরওয়ালার হুকুম তামিল না করলেই নয়। কাজেই সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে চলল সাঙকে পথ দেখিয়ে।

কয়েকদিন উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ক্রমাগত চলতে চলতে সাঙ ক্রমশই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে

কিছুদূর যেতেই তাঁদের নজরে পড়ল একটী ছোট্ট নদী—তার সুনীল, স্বচ্ছ জল নিয়ে তর তর করে বয়ে যাচ্ছে রুক্ষ মরুর বুকে। সাঙ তাঁর আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে নিলেন তার জলে। আর ঠিক করলেন রাত্রিটা বিশ্রাম করবেন তারই তীরে। দারুণ ক্লান্তিতে তাঁর শরীর অবশ হয়ে আসছিল। জল পান করার পর তাঁর স্নায়ু যেন আরও শিথিল হয়ে এলো। তিনি একেবারে ঘুমে এলিয়ে পড়লেন বালির ওপর। মাঝরাতে এক দুঃস্বপ্নে সাঙের ঘুম ভেঙে গেল। এক অস্বস্তিতে তিনি চোখ চাইলেন। আধো অন্ধকারে তারা ভরা আকাশের নীচে সব কিছুই আবছা দেখা যাচ্ছে। সাঙ অস্পষ্ট দেখলেন যেন তাঁর সঙ্গী পথপ্রদর্শক একটা খোলা তরোয়াল হাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। সাঙ ভাবলেন—একি স্বপ্ন ? তিনি চোখ রগড়ে ভাল করে দেখবার জন্য উঠে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সঙ্গী তাঁরই পাশে শুয়ে ঘুমের ভান করছিল। সাঙকে নিদ্রিত দেখে সে ভেবেছিল—তরোয়ালের এক ঘায়ে সাঙের জীবন শেষ করে দিতে পারলে আর তাকে কষ্ট করে হামি যেতে হবে না। ফিরে গিয়ে সে হয়তো বলবে—সাঙকে ঠিকই পৌঁছে দিয়েছে হামিতে। কিন্তু তরোয়াল খুলে এগিয়ে যেতে যেতে তার হাতপা বার বার কেঁপে উঠছিল অন্তরের কী একটা ত্রাসে। ইতিমধ্যে সাঙ জেগে উঠেছেন—উঠে বসেছেন। সঙ্গীটির ভিতরের সমস্ত পাপশক্তি নিঃশেষে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল সাঙের পবিত্র দৃষ্টির তেজে। সে তা সহ্য করতে পারল না। তাই তখুনি তার তরোয়ালটা খাপের মধ্যে পুরে মাটীতে শুয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। সাঙ নিজেও সঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না, জানতে পারলেন না ব্যাপারটা কী ? কিসের জন্য তাঁর সঙ্গী তাঁকে হত্যা করতে চায় ? উদ্বিগ্ন মনে সাঙ সারা রাত জেগেই কাটালেন। উষার প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন দিগন্তের দিকে। বহুদূর এসে

পিছনে তাকিয়ে দেখলেন একমাত্র সঙ্গী পথপ্রদর্শক ইতিমধ্যেই তাঁকে ফেলে পালিয়েছে। তথাগতকে ধন্যবাদ! দুষ্ট সঙ্গী অপেক্ষা সঙ্গীহীন চলা অনেক শ্রেয়।

কিন্তু সঙ্গীহীন চলারও বিপদ অনেক। পথের সবটাই অজানা। বিশেষ করে এই অনন্ত বালির রাজত্বে একটা কোন বাঁধা পথ খুঁজে বার করা একান্ত দুঃসাধ্য। যেখানে, যেদিকে চাওয়া যায়—সেই-দিকেই চোখে পড়ে কেবল ধূসর বালির রাশি মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে আছে। ধূ ধূ করছে অনন্তশূন্য দিগন্ত পর্যন্ত। তারপর আকাশে-বালিতে একাকার। সেখানে দিকই সব সময়ে চিনে ওঠা যায় না তা পথ। সাঙ এক দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। এই তো সবেমাত্র পথের বিপদের সুরু।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কেমন করে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। পথ নিশ্চয়ই আছে। সেই পথে যাতায়াত করে বণিকরা দেশে-বিদেশে। সেই পথে এসেছিল ভারতবর্ষ আর খাশগড় থেকে বৌদ্ধ শ্রমণরা চীনদেশে। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করলেন —মরুর বাহন হলো উট। এইসব উটেরা যেপথে যাতায়াত করে সে পথে নিশ্চয় তারা মলত্যাগ করে থাকে। এইতো একটা উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। মহাসমুদ্রের বুকে কুটোটির মতো তিনি ঐ উপায়টাকেই একটা মস্তবড় সহায় বলে ধরে নিলেন। বহু খোঁজা-খুঁজি করে সাঙ বার করলেন উটেদের পরিত্যক্ত শুকনো মল। ক্রমশঃ সেই পথে যেতে যেতে দেখলেন পথের মাঝে মাঝে পড়ে আছে মৃত জন্তুর কঙ্কাল। শুকনো চামড়া, হাড়, মাংস। এই সব চিহ্ন খুঁজে বার করতে তাঁর অনেক সময় বৃথা কেটে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি অন্য উপায় কিছু না পেয়ে এই একমাত্র উপায় সম্বল করে যাকে বলে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে মরুভূমির ওপর দিয়ে পথ করে চলতে লাগলেন।

এইভাবে এগিয়ে চলতে চলতে একদিন দুপুরের খর সূর্যের তাপে অদূরে দেখলেন—একদল সৈন্য তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে পশম আর পশু লোমের পোষাকগুলো দুপুরের রোদে যেন ঝলমল করছে। এত ঝকঝকে সে দৃশ্য যে সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেই সৈন্যদল এক একবার যাচ্ছে এগিয়ে আবার মাঝে মাঝে থেমে পড়ছে। সঙ্গে তাদের বহু উট আর ঘোড়া। সাঙ বুঝলেন এরা সব মায়ার জীব—মারের চর। মার বুদ্ধের সাধনার পথে হয়েছিল পরম শত্রু। মহাস্থবির আনন্দকে গৃধ্রের রূপ ধরে দেখিয়েছিল ভয় বোধি সাধনায় এই মারই হল জাগতিক জীবের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বোধির উন্মেষে এ মারভয় দূর হয়। মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অপূর্ব শক্তির আলো। তিনি তথাগতের নাম নিয়ে নির্ভীক হৃদয়ে, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চললেন নিজের পথে। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন সে সব সৈন্য যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল এক নিমিষে। আসলে এসব হলো মরীচিকার খেলা।

রাতে যখন নিস্তব্ধ, নির্জন, মরুভূমির বুকে সবদিক ছেয়ে নামে অন্ধকার তখন আর পথ চলা যায় না। এই অন্ধকারে মারের অসংখ্য অনুচর আলো জ্বালিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায় অশরীরী প্রেতাত্মা হয়ে। এরা হলো আলেয়ার আলো। এরা সাঙের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করতে পারল না। তবে মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হতে লাগল দুপুরের রোদে উত্তপ্ত শুকনো বালির ঝড়। এগুলো একেবারে মাথার ওপর ঝরে পড়ে আগুনের বৃষ্টির মতো। এইভাবে কিছুদিন পথ চলার পর সাঁঙের যে অবস্থা হল তা অবর্ণনীয়। দিনে প্রচণ্ড রোদে তাঁর সারা শরীর যেন তপ্ত কড়ায় ভাজা হয়ে উঠতে লাগল। রাতের শীতে আবার জমে যাবার উপক্রম। তার ওপর আছে ক্ষুধা আর তৃষ্ণার বিষম তাড়না। তাঁর সমস্ত শরীরের স্নায়ু যেন শিথিল হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু তাঁর বজ্রের মতো মন

হয়ে উঠতে লাগল কঠোর থেকে কঠোরতর। যতই তিনি বেশী করে শারীরিক ক্লেশ পেতে লাগলেন, যতই তাঁর পথের ওপর বাধার পাহাড় বেশী করে জমতে লাগল ততই তিনি তাঁর সঙ্কল্পে আরও সুদৃঢ় হতে লাগলেন বেশী করে। হিউ-য়েন-সাঙ হলেন জগতের সেই জাতের লোক যাঁরা দুঃখকে আমন্ত্রণ করেন তার সঙ্গে মিতালী করতে। বিপদকে আহ্বান জানান তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে।

এদিকে তিনি চলেছেন তো চলেইছেন। এ পথের যেন শেষ নেই। এ চলারও যেন আর ক্ষান্তি নেই। পিঙ্গল বালির স্তূপ দেখে দেখে চোখের দৃষ্টি যেন বিকল হয়ে উঠল। হে পৃথিবী, কোথায় কত দূরে তোমার সেই নয়নাভিরাম শস্যশ্যামলা স্নিগ্ধ রূপটা। আতপ্ত বালির রুক্ষ ধূসর রূপে আর পশুকঙ্কাল পরিকীর্ণ জনমানব-হীন রাজত্বে সাঙের অন্তর ভরে গেছে এক জ্বলন্ত শ্মশানের বীভৎস-তায়। এখান থেকে মনেও পড়ে না যে সারা দুনিয়ায় কোন জায়গায় বালির পাহাড় আর বালির সমুদ্র ছাড়া আর কিছু শীতল, স্নিগ্ধ কোন পদার্থ থাকতে পারে। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয় এই নিস্তব্ধতা। এ এক রাজত্ব। প্রাণের কোন স্পন্দন কোন চিহ্ন এখানে নেই। সাঙ যেন শুনতে পান তাঁর নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের আওয়াজ। নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও ভারী হয়ে বাজে নিজের কানে। এমন নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতায় ভরা এ অঞ্চল। সাধারণ মানুষ একা এখানে কিছুদিন থাকলে নির্ঘাৎ উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাঙ সেই ভয়ঙ্কর রাজ্যে একা চলতে লাগলেন শ্মশানেশ্বর শিরের মতো স্বীয় সঙ্কল্পে স্থির হয়ে। দিন আসে রাত্রি হয়। আবার আসে দিন তাও যায় চলে। এই ভাবে কত দিন যে এলো আর গেল সাঙের নিঝুম মনে তার কোন হিসেবই হয়তো রইল না।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন দিগন্তে বালির রেখা আর আকাশের মাঝখানটা যেন একটু একটু করে ফাঁক

হয়ে গেল। আর সেখানে অল্পে অল্পে ভেসে উঠল কয়েকটি প্রাসাদের চূড়া। তিনি যত এগিয়ে আসতে লাগলেন ততই বালির স্তূপের আড়াল থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল—পঞ্চ দুর্গের প্রথমটীর চূড়া। সাঙ আস্তে দু হাত তুলে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। তাঁর মন আশার আলোয় ভরে গেল। যাক্ এতদিন পরে স্বাদু শীতল জলে শুক্‌নো গলা ভেজান যাবে। আতপ্ত শরীরকে করা যাবে শীতল। নিবৃত্তি করা যাবে এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার।

এই সমস্ত ভাবছেন সাঙ পরম আনন্দে—আর ছুটে চলেছেন দুর্গের দিকে। হঠাৎ তাঁর মনে এক সন্দেহের অন্ধকার ছায়াপাত করল। মনে পড়ল তিনিতো সম্রাটের অনুমতিপত্র সঙ্গে আনেননি। তবে কেমন করে তিনি যাবেন ঐ দুর্গেতে। গেলেও ঐ দুর্গের অধিপতি কী তাঁকে রেহাই দেবেন সহজে। যাবার পথে হয়তো আবার হবে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। তিনি দুর্গের কাছাকাছি এসে একটা শুক্‌নো খালের ভিতর লুকিয়ে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত্রে তৃষ্ণার জ্বালায় আর স্থির থাকতে না পেরে তিনি বার হয়ে পড়লেন খালের ভিতর থেকে। তারপর দুর্গের মধ্যে ঢুকে তার প্রাঙ্গণে একটা জলের ফোয়ারা খুঁজে বার করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি জলপান করবার জন্যে অঞ্জলি বাড়িয়েছেন অমনি ঘটলো বিপদ। কোথা থেকে একটা তীর এসে অলক্ষ্যে তাঁর কাঁধে সাঁ করে গেঁথে গেল। দারুণ যন্ত্রণায় সাঙের সারা দেহ কুঁচকে উঠল—তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আমি একজন বুদ্ধের সেবক, চীরধারী সন্ন্যাসী।—

আসলে রাতের অন্ধকার সত্বেও সাঙের এই লুকোচুরি দুর্গের রক্ষী প্রহরীদের চোখ এড়ায়নি। এ তীর নিক্ষেপ করেছিল তারাই। তারাই আবার সাঙের কাতর আর্তনাদ শুনে সবাই ছুটে এলো। তুলে ধরল তাঁকে। তীর দেহ থেকে মোচন করা হল। তারা

দেখল এ সত্যিই একজন ভিক্ষু পরিব্রাজক। সাঙকে তারা ধরে নিয়ে গেল দুর্গের অধিপতির কাছে। সাঙ কিছু কথা বলার পূর্বেই জানালেন তাঁর আকণ্ঠ তৃষ্ণার কথা। শীতল পানীয় আনা হল সাঙের জন্য। তাতে তৃষ্ণা মিটিয়ে সাঙ যেন নবজীবন ফিরে পেলেন। তারপর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে অধিপতিকে স্বস্তিবাচন করে বললেন—

শুনুন ভদ্র আমার অভিলাষ। আর কেন যে আমি এখানে এসেছি তারও কারণ আমি বলছি। আপনি নিজেও তো একজন বৌদ্ধ। আপনি তো জানেন—বুদ্ধের জরা-মরণ-শোক জয়ী নির্বাণের বাণী, অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিধি, অহিংসা মন্ত্রের উপাসনা এ সবই এখনও রয়েছে পৃথিবীর লোকের মনে অটুট। তবুও আমার মনের সংশয় দূর হল না আর্য। তবুও আমার দ্বিধা রয়ে গেল অন্তরে। বুদ্ধের বাণী যদি অটুট রইল তবে কেন মানবসমাজের আবার এই জ্বালা। সদ্ধর্মের কেন এই অবনতি। এর উপরও এসেছে আবার এই ধর্মে ভেদ। আমি এর নিকাকরণ করতে চাই। মহাচীনের মধ্যে এমন একজন জ্ঞানী আমি পাইনি যিনি আমার চিত্তের এসব দ্বন্দ্ব দূর করতে পারেন আমাকে দেখাতে পারেন নিঃসংশয়তার আলো ভরা পথ। আমি হলাম চীরধারী সন্ন্যাসী। মুষ্টিভিক্ষাই আমার সম্বল। তবুও কেন জানি আমার মনে হয় ভগবান শাক্যসিংহ আমার জীবনে তাঁর কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনকরতে চান। নইলে আমার পক্ষে তো বাসনা করা সাজেনা এই দুস্তর মরুভূমি পাহাড় নদী পার হয়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যাবার। তবু আমি সেখানে যেতে চাই। সেখানকার জ্ঞানতপস্বী মহাস্থবির দের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। পেতে চাই নতুন পথে চলার নির্দেশ—যে পথে ধর্মের মধ্যে থাকবে না কোন ভেদ। হে মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা, হে পরম বৌদ্ধ, আপনি যদি আমার এই সৎচিন্তায় সাহায্য না করেন তবে জীবনে ভগবান বুদ্ধের কোন্ ইচ্ছা আপনি সফল করলেন? একজন ভিক্ষুকে

শুধু এইটুকু ভিক্ষা দিন। এইটুকু মাত্র আমার প্রার্থনা। আপনি তো দেখতে পেলেন তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে আমি ভীত নই। আর তা যদি হতাম তবে একান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এই দারুণ মরুভূমির উপর দিয়ে নিঃসঙ্গ আসার কথা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। কিন্তু হে ন্যায়াধীশ, আমি মহত্তর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই সমস্ত বাধা বন্ধ অতিক্রম করে যেতে চাই। আমি জানি করুণাময় বুদ্ধ আমার চিরদিনের সহায়। বুদ্ধ আপনারও সর্বাঙ্গীন কুশল করুন।

হিউ-এন-সাঙের এই অটুট আত্মপ্রত্যয় ভরা বাগ্মিত দুর্গাধিপতির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি নিজের আসন থেকে উঠে গিয়ে পরম ভক্তিভরে সাঙের পাদবন্দনা করলেন। তারপর সাদরে আহ্বান জানালেন প্রাসাদে তাঁর আতিথ্য গ্রহণকরবার জন্য। সেখানে তিনি হিউ-য়েন সাঙকে কয়েকদিন যথোচিত পরিতুষ্ট করলেন —ভোজ্য-পানীয় আর সেবায়। সাঙের শরীর আবার সতেজ হয়ে উঠল—বিশ্রামে আর আহারে।

দু'এক দিন পরেই আবার তিনি পথে নামবার সংকল্প করলেন। দুর্গের অধিপতি তাঁর সঙ্গে দিলেন অনেক খাদ্য। চামড়ার থলিতে পানীয় জল। আর দিলেন অন্য দুর্গাধিপতিদের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র। যাতে বিনাবাধায় তিনি চীনের এলাকা পার হয়ে যেতে পারেন। তবে সাঙকে তিনি বিশেষভাবে সাবধান করলেন পঞ্চম দুর্গের অধিপতি সম্পর্কে। জানালেন সাঙ যেন ভুলেও তাঁর এলাকার মধ্যে না যান। কারণ তিনি হলেন বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী।

হিউ-য়েন সাঙ এক এক করে সেই চারটী দুর্গ পার হলেন অতি সহজেই। সঙ্গের রসদ আর দুর্গাধিপতিদের সেবা তাঁর পথের কষ্টকে অনেক কমিয়ে দিল। কিন্তু চারটি দুর্গ পার হবার পরই সাঙের মনে পড়ল প্রথম দুর্গাধিপতির কথা। তিনি বারবার তাকে সাবধান

করেছেন যেন পঞ্চম দুর্গাধিপতির কবলে কোন রকমে না পড়েন। সুতরাং মরুভূমিতে আসল যানবাহন চলাচলের যে পথ সে পথ সাঙকে ছাড়তে হল। তিনি মনে করলেন যদি ও পথে গেলে তিনি নিজের অজান্তেই গিয়ে হাজির হন পঞ্চম দুর্গের এলাকার মধ্যে।

আবার সেই পরিচয়হীন অজানা মরুভূমি। আবার সুরু হল তাঁর কষ্ট। দুর্গের মালিকরা যা রসদ দিয়েছিল তাও ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সঙ্গে আছে কেবল একটা চামড়ার থলিতে জল আর আছে অতি প্রয়োজনীয় বাহন—ঘোড়াটি। ধূ ধূ বালির রাজত্বে সাঙ একদিন দেখলেন যে তিনি পথের নিশানা খুঁজে পাচ্ছেন না। বাঁধাধরা পথ ছেড়ে তিনি পড়লেন বিষম বিপদে। দিক আর পথ নির্ণয় করবার জন্যে তিনি লক্ষ্য করলেন সূর্যের উদয় আর তাঁর অতিক্রমণ পথ। তারপর তিনি দিনের বেলায় নিজের ছায়ার গতি লক্ষ্য করে চলতে লাগলেন। কিছুরই সঠিক নিশানা নেই। সবই একান্ত অজানা। এই অজানার মধ্যেই সাঙ তাঁর বজ্র কঠোর মনের শক্তিতে স্থির হয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। আর মনের বলকে অটুট রাখতে পাঠ করতে লাগলেন প্রজ্ঞা পারমিতা।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। একদিন প্রচণ্ড দুপুরের রোদে মরুভূমির ওপর যখন চলছে আগুনের খেলা—সাঙ ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে একটী মাত্র চামড়ার থলিতে জল। সেই-ই তখন সাঙের কাছে কত অমূল্য। সেটুকু কি যখন তখন খাওয়া যায়। কিন্তু তৃষ্ণার জ্বালাও তো আর সহ্য হচ্ছে না। সে যে উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চায়। তৃষ্ণায় এদিকে কণ্ঠতালু গেছে শুকিয়ে। জিভ যেন টেনে ধরছে ভিতরের দিকে। বারবার তিনি ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করলেন জিভ দিয়ে। কিন্তু সেও গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে। তখনও তিনি মনে করছেন তিনি তাঁর শরীরকে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। দারুণ

কষ্ট সহ্য করবার মত শক্তি যেন তাঁর অটুট হয়। এদিকে তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। সেই মুহূর্তে সাঙ তাঁর কম্পিত হাতে তুলে ধরলেন সেই ভারী জলের থলিটা ঠোঁটের কাছে। তৃষ্ণায় অসক্ত শিথিল হাত ভাল করে হয়তো ধরতে পারেনি থলিটা। সেটি ফস্‌কে পড়ে গেল বালির ওপর। সাঙ দেখলেন—স্থির হয়ে—পাথর হয়ে দেখলেন, কেমন করে সেই জলটুকু—সেই প্রাণরসটুকু দুপুরের আতপ্ত মরুভূমি সোঁ সোঁ করে শুষে নিল। সাঙের মনে হল যেন একটা বিকট রাক্ষস এক নিমেষে শুষে নিল তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত। শিরা ধমনীতে যেন সমস্ত স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। হৃদ্‌পিণ্ডটা পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠছে। এখনই যেন বুক ফেটে সেটা বেরিয়ে আসতে চায়। চারদিন পাঁচ রাত্রি এক ফোঁটা জল তাঁর গলা দিয়ে নামেনি। কী অসহ্য এই কষ্ট। কী ভীষণ এই তৃষ্ণার জ্বালা। সাঙের শরীরের প্রতিটি কোষ চাইছে আকুল হয়ে একবিন্দু জল। অধৈর্য শরীর ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছে। আর যে পারা যায় না। তাঁর হাতের অশ্ববল্গা শিথিল হয়ে এল। ঘোড়া ছুটে চলেছে। কিন্তু সাঙের মনে হচ্ছে যেন কতকাল—কতকাল তিনি জল পান করেন নি। একটু জলের প্রত্যাশায় যেন তাঁর যুগ যুগান্তর কেটে যাচ্ছে। ঘোড়ার এক একটা পদক্ষেপ মনে হচ্ছে কত দীর্ঘ। ক্রমশঃ তাঁর শরীরের স্নায়ু ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। সারা মস্তিষ্ক আর বুদ্ধি চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নেমে আসতে লাগল একটা অন্ধকার। তিনি অবশ হয়ে পড়তে লাগলেন ঘোড়ার পিঠের ওপর। সাঙ ভাবলেন—এইবার এই দেহের শেষ। শেষবারের মত তিনি ডেকে বললেন—হে তথাগত তুমি ত সর্বতাপহারী। হে গৌতম, এই যদি তোমার ইচ্ছা তবে তাই হোক। কিন্তু তাঁর শুকনো গলা দিয়ে একটু আওয়াজও বের হল না। সাঙ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটে চলল ইচ্ছামত।

ঘোড়াটিও তৃষ্ণার্ত। আর সেও বুঝেছে তার প্রভুর অবস্থা। মাটী শুঁকতে শুঁকতে সে চলতে লাগল জলের সন্ধানে। মরুভূমির জীব সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খুঁজে বার করল এক টুকরো মরুদ্যান। একবার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হতেই তিনি দেখতে পেলেন সমুখে বয়ে চলেছে একটী ছোট্ট নদী—তার স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলধারা নিয়ে। চারদিকে তার সবুজের গালচে পাতা। ঢল ঢল করছে ঘাস। গাছে গাছে ফলে আছে খেজুর। জায়গাটি ভারী মনোরম আর ছায়াচ্ছন্ন।

একি স্বপ্ন? না মায়া? না তাতো নয়। তবে নিশ্চয় মরীচিকা-ভাবলেন সাঙ। কিন্তু তা যাই হোক ভাবলে আর চলবে না। মৃত্যুর আগে একবার দেখবেন তিনি। একটা দুর্নিবার আবেগে সাঙ তখন লাফিয়ে পড়েছেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। পা দুটো নিশ্চল। তা হোক। তিনি চললেন বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে। শেষে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এসে প্রবহমান জলধারার বুকে। সারা অঙ্গ দিয়ে তিনি জল পান করলেন। আঃ কি শান্তি! কী তৃপ্তি! হে করুণাঘন, হে তিমিরনাশন, এ প্রাণ, এ দেহ, সবই তোমার। আমার নিজের বলতে আর কিছু রাখব না প্রভু। তোমারই অপার করুণা বয়ে যাচ্ছে এই রুক্ষ মরুর বুকে স্বচ্ছ জলধারার মতো। এ অবগাহন আমার তোমারই করুণাধারায় স্নান। এ প্রচণ্ড তৃষ্ণা তুমিই তোমার কৃপাবারিতে হরণ করলে প্রভু!

মরুদ্যানের সতেজ সবুজ ঘাসে ঘোড়াটি প্রাণভরে চারণ করল। সেও জলপান করল আকণ্ঠ। এ যাত্রা সাঙ আর তাঁর বাহন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এমনি করে রেহাই পেলেন। বহুতর বাধা, বহু বিপদ এমনি করে উত্তীর্ণ হয়ে—কিন্তু একান্ত অক্ষত দেহেই—তিনি একদিন এসে হাজির হলেন হামি সহরে।

চার

হামি হল গোবির পশ্চিম পারে ছোট্ট একটা সহর। সহর বলার থেকে একে একটা বড় মরুত্থান বললেই ভাল হয়। কারণ এর চার পাশেই রয়েছে ছড়িয়ে মরুভূমির বালির সমুদ্র। হামি আকারে ছোট কিন্তু তার নামডাক বড় কম নয়। এই ছোট্ট হামির ওপরেই ভারতীয় শ্রমণরা গিয়ে বৌদ্ধধর্মের একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিলেন। সুবিধেও ছিল প্রচুর। এখান থেকে যোগাযোগ রাখা যেত ভারত, পারস্য, মধ্য এশিয়ার আরও অনেক বড় বড় জায়গার সঙ্গে চীনদেশের। সেই জন্যেই সেখানকার বৌদ্ধ বিহারের নাম তখনকার দিনে ও অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে ফিরত। চীনদেশে যেতে গেলে বা চীন থেকে আসতে গেলে হামিকে এড়িয়ে যাওয়া চলত না কোন মতেই।

হামিতে প্রবেশ করার মুখে সাঙ জানতে পারলেন—কেমন করে না জানি তাঁর আসার খবর হামিতে পূর্বেই পৌঁছে গেছে। সহরের তোরণে তিনি দেখলেন নবপল্লব—মাঙ্গলিকের চিহ্ন। তোরণদ্বারে সাঙ উপস্থিত হতেই হামির বৌদ্ধবিহারের তিনজন প্রবীণ শ্রমণ এসে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। সাঙ দেখলেন তাঁদের সবার চোখে আনন্দের অশ্রু। তিনি শ্রমণদের সঙ্গে পা বাড়ালেন বৌদ্ধবিহারের দিকে।

কিছুদিন তাঁর বিশ্রামে কাটল হামির বৌদ্ধবিহারে। ইতিমধ্যে হামি থেকে তার পাশের সহর তুরফানে খবর ছড়িয়ে পড়ল। চীনের বিখ্যাত জ্ঞানী সাঙ চলেছেন ভারতবর্ষে এই পথ দিয়ে। তুরফানও হামির মত একটা বড় মরুত্থান। কিন্তু তার রাজার প্রতাপ ছিল সেকালে প্রচণ্ড। তাঁর দরবারেও ঐ খবর

পৌঁছাতে দেরী হল না। রাজা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জগতের একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী তাঁর রাজ্যের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন—তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করার সৌভাগ্য-সুযোগের থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন না। ভাবলেন এই তো সময়—এরপর আবার এ সৌভাগ্য হয়তো আর কখন না-ও আসতে পারে। তিনি সাঙকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন ঘোড়সোয়ার পাঠালেন হামিতে। রাজার আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে সাঙ এলেন তুরফান রাজের আবাসে।

তুরফানের রাজা চু-এন্-তাই ছিলেন যেমন ক্রূরকর্মা তেমনি আবার বুদ্ধের একজন পরম ভক্ত। সাঙ রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাঁর স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে এসে তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে বন্দনা করলেন। বললেন—হে মহাভিক্ষু, হে প্রভু, আপনি এসেছেন এ খবর আমার কানে যাওয়া থেকে আমি আনন্দে আহার-নিদ্রা ভুলে গেছি। আমি জানতাম আপনি আজ রাতে আমার প্রাসাদে পদার্পণ করবেন। তাই আমি নিজে আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কেউ নিদ্রা যাইনি। আজ আমরা সারা রাত পাঠ করেছি বৌদ্ধশাস্ত্র আর সশ্রদ্ধ চিত্তে অপেক্ষা করে আছি আপনার পুণ্য পদার্পণের। তুরফান রাজপ্রাসাদে সাঙকে দু'একদিন বিশ্রাম নিতে হল। কিন্তু প্রাসাদের রাজকীয় আড়ম্বর আর অত্যধিক সুখের মধ্যে সন্ন্যাসীর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। তিনি একদিন রাজার কাছে বিদায় চাইলেন।

এদিকে তুরফান রাজ চু-এন্-তাই মনে মনে সংকল্প করেছেন সাঙকে তিনি রাজপ্রাসাদে তাঁর পরিবারের ধর্মগুরু আর তুরফানের বৌদ্ধমণ্ডলীর প্রধান করে রাখবেন তাঁর কাছে।

রাজা সাঙকে তাঁর বাসনা জানালেন। রাজার কথা শুনে সন্ন্যাসীর মন বিষম অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন—কেন আবার এ বন্ধন! রাজসম্মান তো আমি চাইনে প্রভু। ধনরত্নে

তো আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই শাক্যসিংহ। তবে কেন আবার এ বিপত্তি। তুমি আমাকে ঘরছাড়া কর—পথে নিয়ে চল অবলোকিতেশ্বর। নিয়ে চল আমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে। এক আলোর রাজত্ব থেকে অপর আলোর রাজত্বে। হে সর্ব-বন্ধন-হারি! তুমি আমার বন্ধন ঘোচাও।

সাঙ অসম্মত হলেন রাজার কথায়।

চু-এন্‌-তাইএর দম্ভে লাগল দারুণ আঘাত। ভক্ত হলেও তিনি ছিলেন ক্রূরকর্মা। আঘাত পেয়ে তিনি বিষধর সর্পের মতো গর্জন করে উঠলেন। আপনার অধম ভক্ত আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসে শ্রদ্ধা করে। আমি আপনাকে আমার রাজপ্রাসাদে রাখার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি। জানবেন প্রভু, পামীরের পাহাড় টলান যায়—কিন্তু চু-এন্‌-তাই এর সংকল্প টলান যায় না।

হিউ-য়েন-সাঙ সমস্ত কথা শুনলেন ধীরভাবে। আবার তাঁর অস্বীকারও জানালেন পরম ধীরভাবে। রাজা ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠে বজ্রকণ্ঠে বললেন—এতক্ষণ আপনার অধম ভক্ত শিষ্য আপনাকে সসম্মানে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু এবার সে অন্যরকম আচরণ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি তার অনুরোধ না রাখেন সে আপনাকে বলপ্রয়োগে ধরে রাখবে। দেখব আপনি কী করে যান এই তুরফান রাজদরবার থেকে।

হিউ-য়েন-সাঙের ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল—রাজা যদি আমাকে বন্দী করেন তবে তিনি আমার সদিচ্ছা বা আমার আত্ম-শক্তিকে বন্দী করতে পারবেন না। থাকবে কেবল আমার নশ্বর অস্থিকটা।

কিন্তু বৃথা ঐ ঘোষণা। রাজার আদেশে সাঙকে বন্দী করা হল। তাঁর চার পাশে প্রহরী নিযুক্ত হল। কিছুতেই তিনি যেন পালাতে না পারেন। তুরফানরাজ ভুল করলেন। সাঙকে তিনি

তখনও ঠিকমতো চিনতে পারেন নি। যে সুকঠিন মনোভাব সম্রাট তাই-সুং এর অনুমতির অপেক্ষা করে নি, ভয়ংকর মরুভূমির প্রাণঘাতী বিপদের মধ্যে বার বার জীবন বিপন্ন হওয়া সত্বেও যা ছিল অটুট তাকে তিনি দেখালেন বন্দীত্বের ভয়। কুসুমকোমল সন্ন্যাসীর মন এক পলকে বজ্রকঠোর হয়ে উঠল। তিনি রাজাকে জানিয়ে দিলেন যদি তাঁকে মুক্ত করা না হয় তবে তিনি এই প্রায়োপবেশনে বসলেন। এখানেই তিনি তাঁর শরীর তিলে তিলে ক্ষয় করবেন উপবাসে।—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

তিনদিন তিনরাত্র কেটে গেল একাসনে—অনশনে। এ এক অপূর্ব আত্মশক্তি। কেউ এক ফোঁটা জল তাঁর গলা দিয়ে নামাতে পারল না। চতুর্থ দিনে রাজা দেখলেন ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তিনি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। যদি গুরু এখানে প্রাণত্যাগ করেন তবে গুরুহত্যার পাতক তাঁকে অর্শাবে। আর এই বিখ্যাত জ্ঞানী তাঁর সভায় উপবাসে প্রাণ দিয়েছেন একথা বাইরে প্রচার হলে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে। তিনি শেষকালে নত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন সাঙের পায়ের কাছে। প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁকে মুক্ত করে দেবার।

তারপর একান্ত ভক্তিসহকারে একান্ত আগ্রহ নিয়ে তিনি আয়োজন করতে লাগলেন তাঁর প্রভুর যাত্রার। সঙ্গে তিনি দিলেন প্রচুর রসদ। খাদ্যসামগ্রী, লোকলস্কর, উট, ঘোড়া। আর তাঁর রাজ্যের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে যে তিয়ানস্ পর্বতমালা—তা অতিক্রম করবার জন্য বহু গরম জামা, পশুলোমের আচ্ছাদন, মোজা, কম্বল, হাতে পরার দস্তানা, মুখে পরার মুখোস, পায়ে দেবার চর্মপাদুকা।

তিয়ানসানের ওপারে হল পশ্চিন তুর্কীস্তানের বিখ্যাত খানের রাজত্ব। সেরাজ্য তখন আলতায়ের কোল থেকে ব্যাক্‌ট্রিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত। তুরফান রাজ সাঙের সঙ্গে দিলেন—পাঁচ-শ সার্টিনের কাপড় দুটী বড় রথ বোঝাই করে। তুর্কীস্তানের খানকে উপহার দেবার জন্য। আর সঙ্গে দিলেন পারদর্শী পথপ্রদর্শকদের। তাদের ওপর হুকুম রইল তিয়ানসান পার করে তাঁকে পৌছে দেবে খানের রাজ্যে।

বিদায় নেবার সময় সপারিষদ রাজা চললেন সাঙকে অনুগমন করে সহরের শেষ সীমানা পর্যন্ত। সঙ্গে চললেন রাজ্যের বৌদ্ধশ্রমণরা। আরও বহু লোক। বিচ্ছেদের শেষ মুহূর্তে তুরফানরাজের চোখ জলে ভরে গেল। সাঙের চোখও শুক্‌নো রইল না। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন— মহারাজ পীত নদীতে যত জল আছে তাদের একত্র করলেও আপনার এই অমূল্য দানের সমান হয় না। আপনার উপহারের প্রাচুর্য ও অন্তরের মহত্ত্বের কাছে সুং-লিং পর্বতের সবচেয়ে উঁচু চূড়োও ছোট মনে হয়।

* * * *

তুরফান রাজ্য ছেড়ে সাঙ এবার চললেন—ইয়েন-চি অধুনা কারাসহ্‌রের দিকে। এবার তাঁকে কতকগুলো পাহাড় টপকে আসতে হল। এইসব পাহাড় বিখ্যাত ছিল রূপোর খনির জন্যে।

তুরফান ও কারাসহ্‌র তখনকার দিনে খ্যাতি লাভ করেছিল বহু প্রাচীন সভ্যদেশ হিসেবে। এই দুই রাজ্যের মধ্যে আগে বহু বণিক যাতায়াত করত বাণিজ্যের রসদ নিয়ে। মরুভূমির উপর দিয়ে যে বিস্তৃত বাণিজ্য পথ চলে গেছে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় এই দুই জায়গাতেই বণিকেরা প্রায়ই কিছুদিন করে জিরিয়ে যেত। কিন্তু পরে এই পথে চোর ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় তারা অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যাতায়াত করতে সুরু করল।

সাঙ নিজে কিন্তু চোর ডাকাতের ভয়কে গ্রাহ্য না করে সেই বহু প্রাচীন সোজা পথ ধরেই তুরফান থেকে আসতে লাগলের কারা-সহ্‌রের দিকে। পথে একবার ডাকাতের দলের হাতে পড়লেন তিনি। কিন্তু সন্ন্যাসী ভিক্ষু সাঙ। তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কিছু না পেয়ে ডাকাতের দল শুধু তাঁর লোকজনকে মার ধোর করে চলে গেল।

এইসব ভয় বাধার সমুখ দিয়ে তিনি মনের বল অটুট রেখে এগিয়ে চলে এলেন। এসে পড়লেন এক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেশে।

ধূসর মরুভূমির বুকে সবুজ একটী ছোট্ট দেশ। উষর রাজত্বের মধ্যে একটুখানি প্রাণস্পন্দন। চারদিকে এর পাহাড়ের বেষ্টনী। তা থেকে অনেকগুলো নদী নেমে এসে এক হয়ে মিশেছে—এই দেশের মাঝখানে। তৈরী করেছে একটী বড় নদী। নাম তার ইউল-তুজ। তার জলে রুক্ষ মাটী হয়েছে নরম। তাতে ফলছে ধান, কড়াই, ভুট্টা। ফলছে আঙ্গুর, পীয়ার, আম আরও কত ফল। এই দেশেরই নাম হল কারাসহ্‌র।

বহু প্রাচীন এক বিশিষ্ট সভ্যতার পাদপীঠ এই কারাসহ্‌র। সাঙ এখানে এসে দেখলেন—এখানকার রাজা একজন পরম ভক্তবৌদ্ধ-অবশ্য হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত। এরাজ্যের সবাই হীনযান 'সর্বাস্তিবাদীন' মতের অনুসরক। রাজ্যের মধ্যে তখন রয়েছে দশটী বড় বড় বৌদ্ধ বিহার। সাঙের আসার খবর পেয়ে কারাসহ্‌রের রাজা নিজে এলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সঙ্গে এলেন তাঁর বহু আমাত্য পরিষদ। এলেন দশটী বিহার ভেঙ্গে বৌদ্ধ শ্রমণের দল।

রাজা তাঁকে সাদরে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তারপর আপ্যায়িত করলেন উৎকৃষ্ট ভোজ্যে, পানীয়ে। সঙ্গে দিলেন তাঁর যাত্রাপথে যে সমস্ত জিনিষের নিত্য প্রয়োজন সেই সমস্ত। কিন্তু সাঙের সঙ্গে যে সমস্ত লোক তুরফান থেকে এসেছিল তাদের অভ্যর্থনা বা আপ্যায়নের

কোন বন্দোবস্তই কারাসহ্রের রাজা বা সেখানকার অধিবাসীরা করলেন না। তুরফান আর কারাসহ্র পাশাপাশি রাজ্য। প্রায়ই তাই তুরফান আক্রমণ চালায় কারাসহ্রের ওপর। সেইজন্য কারাসহ্রের লোকরা জাতক্রোধ ছিল তুরফানের লোকদের ওপর। ফলে সাঙের এখানে একরাতের বেশী থাকা হল না। পরদিন প্রাতেই তিনি যাত্রা করলেন কুচার পথে।

কুচা আর কারাসহ্র। মানচিত্রে দুটী রাজ্যকে দেখায় যেন ছোট্ট দুটী যমজ-বোন। কিন্তু আসলে এদের ভাগ করে রেখেছে তিয়ানসান পর্বত শ্রেণীর একটা ছাঁট। সাঙ সেটী ডিঙ্গিয়ে বুগুর আর কিরিশ মরুস্থানের ভিতর দিয়ে এসে পড়লেন কুচাতে।

কুচার চীনা নাম হল চু-চে। আর সংস্কৃতে একে ডাকা হত কুচি বলে। তখনকার দিনে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে নাম করা জায়গা ছিল এই কুচা। কুচার ঐহিক ঐশ্বর্যে, জাঁক জমকে, কলা-কৃষ্টির মার্জিত রূপে সাঙ রীতিমতো বিস্মিত হলেন। লিখলেন তাঁর ভ্রমণ পঞ্জীতে—"কুচা রাজ্য পূর্ব পশ্চিমে প্রায় হাজার লী আর উত্তর দক্ষিণে ছশ' লী বিস্তৃত। রাজধানীর এলাকা হল ১৭ থেকে ৮ লী। এখানকার মাটী লাল। কলাই আর গম চাষের সমূহ উপযোগী। কেঙ্তাও নামে যে বিখ্যাত ধান আছে তার চাষ হয় এই অঞ্চলে। বাগানে বাগানে ফলে পীয়ার, প্লাম, পীচ, এপ্রিকট। ফলে অজস্র আঙ্গুর আর রসে ভরা বেদানা। এখানকার খনি থেকে ওঠে সোনা, তামা, লোহা, দস্তা আর টীন। এর আবহাওয়া কিছুটা নরম। দেশের লোকের নৈতিক মান অতি উচ্চস্তরের। এদেশে যে অক্ষর প্রণালী প্রচলিত তা ভারতীয় অক্ষর থেকে একটু এদিক ওদিক করে নিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিষ হল এখানকার সুরশিল্পীরা। তাদের প্রাণমাতানো বাঁশী আর বীণার বাজনার কাছে বোধ হয় সব কিছু হার মানে।"

সাঙ যখন কুচাতে পৌঁছান তখন সেখানকার কৃষ্টি সভ্যতার মধ্যে ভারতীয় ও ইরাণী প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। সেখানকার ধর্ম ও শিল্পকলা ছিল সবদিক দিয়ে ভারতীয়দেরই অনুরূপ। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে যে বহু বিস্তৃত সংস্কৃত চর্চার সুরু হয় তার মূলে ছিলেন একজন পরম প্রখ্যাত মহাপুরুষ কুমারজীব।

ভিক্ষু কুমারজীব বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধারা চীনের জনসাধারণের মনে বহাবার জন্য আর বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি চীনা ভাষায় তর্জমা করার জন্য দুর্গম গিরি কান্তার মরু অতিক্রম করে এই পথেই গিয়েছিলেন মহাচীনে। সে হল সেই ৩৪৪ থেকে ৪১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। হিউয়েন-সাঙ-এর প্রায় আড়াই শো বছর আগেকার কথা।

কুমারজীবের পিতা ছিলেন ভারতীয় আর মাতা হলেন কুচার রাজকন্যা। অতি অল্প বয়স যখন তাঁর তখনই তিনি অধ্যয়ন করতে চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে কুমারজীব তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে পাঠ করতে সুরু করেন—বেদ উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্র পর্যন্ত সমস্ত পুঁথি। দীর্ঘদিন পরে তিনি কুচায় ফিরে আসেন সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য নিয়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। সেই সময়ে তিনি মহাযান মতে অর্হত্বে দীক্ষা নেন ইয়ারকন্দের এক রাজপুত্রের কাছ থেকে। কুমারজীব কুচাতে অবস্থান করেছিলেন ৩৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে একদল চীনা সৈন্য কুচা রাজ্য আক্রমণ করে আর কুমার-জীবকে তাদের সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে যায় উত্তর চীনে। কুমারজীব চীনে গিয়েও তাঁর গ্রন্থ রচনা থেকে বিরত হননি। কুচা আর চীনে বসে তাঁর অপূর্ব মণীষা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ঢেলে দিয়ে তিনি যে সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল মাধ্যমিক মতবাদের দর্শন সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ—সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক আর সুত্রাংলকার।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে এই কুচা থেকেই তখনকার দিনে সংস্কৃত চর্চার প্রসার ঘটে ছিল সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত।

কুচাতে রাজত্ব করতেন যে রাজবংশ চীনাভাষায় তাঁদের নাম ছিল সু-ফা। সংস্কৃতে বলা হত সুবর্ণ বংশ। হিউয়েন সাঙ যখন কুচাতে পোঁছালেন তখন সিংহাসনে রয়েছেন সুবর্ণ পুষ্পের পুত্র সুবর্ণ দেব। কুচার তখনকার দিনে প্রচলিত তোখারিশ ভাষায় তাঁকে ডাকা হত স্বর্ণতেপ বলে।

স্বর্ণতেপ নিজে ছিলেন একজন পরম বৌদ্ধ। কিন্তু হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রমণ মোক্ষগুপ্ত। হীনযান শাস্ত্রে প্রগাঢ় বুৎপত্তির জন্য সে সময়ে মোক্ষগুপ্তের নাম বৌদ্ধ জগতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কুমারজীব নিজে ফিরে এসেছিলেন বটে মহাযান সম্প্রদায়ে। কিন্তু তাতে করে কুচার জনসাধারণের মনে হীন যান মতের আদর এতটুকুও কমেনি। তারা সবাই ছিল হীন যান। আর তাছাড়াও কুচার বিভিন্ন বিহার সংঘারামে যে পাঁচ সহস্র শ্রমন বাস করতেন তাঁরাও সবাই ছিলেন হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত।

রাজা স্বর্ণ তেপের সঙ্গে ছিল চীন সম্রাটের বিশেষ বন্ধুত্ব। সাঙ নিজে চীনের অধিবাসী বলেও বটে আর বৌদ্ধ শ্রমন হিসেবেও রাজার কাছ থেকে যে আদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন তাতে কোন ত্রুটিই ঘটল না। কিন্তু বিরোধ বাঁধল শাস্ত্রালোচনার সময়। হীনযানী মোক্ষগুপ্ত এগিয়ে এলেন মহাযানী সাঙের সঙ্গে তর্ক করতে। সঙ্গে এলেন আরও বহু শ্রমন।

তর্ক যুদ্ধ সুরু হল। কুচার শ্রমনদের ধর্ম মত ছিল প্রাচীন বৈভাষিক আর সৌত্রান্তিক মতবাদ থেকে নেওয়া। সুতরাং মহাযান ভিক্ষু সাঙের সঙ্গে তাঁদের মতের ঐক্য কোন জায়গাতেই হল না। বিতর্কের সময় মোক্ষগুপ্ত উল্লেখ করলেন বিভাষশাস্ত্র ও অভিধর্ম-কোষ শাস্ত্রের দার্শনিক মতবাদের কথা। সাঙ উত্তর দিলেন—এই দুটী

গ্রন্থ আমার বিশেষ পরিচিত। কারণ মহাচীনে এ গ্রন্থ দুটী আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ দুটী গ্রন্থ পাঠ করেও আমার চিত্তের দ্বিধা মেটেনি। আমার মনে হয় এদের মতবাদ অত্যন্ত সাধারণ স্তরের তো বটেই উপরন্তু এদের মধ্যে গভীরতার সন্ধানও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। আমি মহাযান মতের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ যোগশাস্ত্র পাঠ করবার অভিপ্রায় নিয়েই চীন পরিত্যাগ করে আসছি।

মোক্ষগুপ্ত বললেন—শাশ্বতও সনাতন বৌদ্ধ-মতবাদ গুলির তুলনায় মহাযান মত হল একেবারেই অর্বাচীন। এসব মতবাদের সঙ্গে স্বয়ং শাক্যমুনির ধর্মোপদেশের কোন সম্বন্ধই নাই। কাজেই এসব গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করেন তাঁরা কেবল কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই চলেন। তাঁরা কদাচ নিজেদের বৌদ্ধ বলে দাবী করতে পারেন না। সত্যি কারের যিনি বুদ্ধ উপাসক তিনি কখনও এসব গ্রন্থ পাঠ করবেন না।

মোক্ষগুপ্তের কথায় মুহূর্তের জন্য সাঙের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল। তিনি উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—যোগশাস্ত্র যে মহাপুরুষ প্রণয়ন করেছেন তিনি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র অবতার। তাঁর মতবাদকে আপনি ভ্রান্ত বলেন—চতুর্দশ নরকের ভয় ও কী আপনার নাই।

এইভাবে কুচার দার্শনিকদের সঙ্গে সাঙের আলোচনা চলল প্রায় দু মাস ধরে। এই দু মাস সাঙকে অপেক্ষা করতে হল কুচাতে। কখন সময় আসে। কখন তিয়ানসানের চূড়াতে বরফ গলে পথ বার হয়। কুচাতে বসে সাঙ মূজার্টের দিক থেকে তিয়ানসান অভিযানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

রাজা স্বর্ণতেপ তাঁর সঙ্গে দিলেন কর্মচারীরদল, উট ও ঘোড়ার একটা রীতিমতো বাহিনী। তারপর তাঁকে সহরের শেষ সীমানাপর্যন্ত অনুগমন করলেন।

পাঁচ

কুচা রাজ্য যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার উত্তর সীমানা দিয়ে চলে গিয়েছে তিয়ানসান গিরিশ্রেণী। কাশ্মীরের উত্তরে পামীরের যে বিখ্যাত মালভূমি আছে—সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ তার উচ্চতার জন্য—সেই পামীরের উত্তরকোণ থেকে এই তিয়ানসানের স্নুরু। তারপর পূর্ব-পশ্চিমে ঢেউ খেলিয়ে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলে সে চলে গেছে খিরঘিজ রিপাব্লিক থেকে একেবারে মঙ্গোলিয়ার ভিতরে। জায়গায় জায়গায় এই তিয়ানসান একশো থেকে তিনশো মাইল চওড়া। আর লম্বালম্বিতে এর দৌড় হল যোলশো মাইলেরও ওপর। তিয়ানসানের গগনচুম্বী চূড়াগুলির কেউ কেউ বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি উঁচু। এদের প্রায় সব কটিই চিরতুষারাবৃত। লোকে বলে যে সৃষ্টির আদিমতম দিনটি থেকে প্রকৃতি এদের মাথায় যে হীরক-শুভ্র তুষারমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন তা কোনকালেই এদের মাথা থেকে নামে না। এই জন্যেই বোধ হয় তিয়ানসান মাঝ এশিয়াতে নাম নিয়েছে 'স্বর্গীয় পর্বত'। তিয়ানসানের শৃঙ্গগুলি এত দুরারোহ যে কোন মানুষই সেখানে উঠবার কল্পনা করতে পারে না। কিছু উঁচুতে আছে গলে পড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই—আর এখন-তখন বইছে তুষার ঝটিকা। তার মধ্যে জমাট বাঁধা তুষারকণা শানানো তীরের ফলার মতো গায়ে এসে বেঁধে। এর পর আছে প্রচণ্ড শীত। সে শীত যে কী ভীষণ তা সহজে অনুমান করা যায় না। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় বুঝি হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতর সমস্ত তরল রক্তের স্রোত জমে বরফ হয়ে যাবে।

হিউয়েন-সাঙ কুচা রাজ্য পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন এই বিরাট বাধার সমুখে। তুরফান আর কুচার রাজারা সঙ্গে দিয়েছেন বহু রসদ, বাহন, আর পাহাড় ডিঙোবার মতো বহু গরম পশু লোমের

জামা-জুতা। সাঙ তাঁর দলবল নিয়ে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলেন। পাহাড়ের উপর কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। নিদারুণ খাড়াই উঁচু পাহাড়ের পর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নীরব প্রহরীর মতো। উঠতে উঠতে সময়ে সময়ে দম ফেটে যাবার উপক্রম হয়। তখন কিছুটা বিশ্রাম—আবার আরোহণ। এইভাবে সাঙ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভাঙতে লাগলেন পাহাড়ের পর পাহাড়। ক্রমশঃ তিনি উঠতে লাগলেন উঁচু থেকে আরও উঁচু রাজ্যে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি এসে পড়লেন চির তুষারের রাজত্বে।—এ রাজত্বে একটা প্রাণী নেই, গাছ পালা নেই—ঠিক যেন মরুভূমি—বালির নয় তুষারস্তূপের। এই তুষার আবার কোথাও কোথাও এমন জমাট বাঁধা শক্ত যে তার তীক্ষ্ণতায় পায়ের চামড়ার জুতা ছিঁড়ে পা কেটে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র তুষারের ঝড়ের কামাই নেই। এর ওপর আছে আবার শ্বাসকষ্ট। অনেক উঁচুতে বাতাসে অক্সিজেন-এর পরিমাণ অনেক কম। কাজেই অল্প পরিশ্রম করতে না করতেই তিনি হাঁপিয়ে যেতে লাগলেন দারুণভাবে। পথ অতি দুর্গম। কোথাও চলতে হয় খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁসে—নীচে থাকে অতলস্পর্শী খাদ। একবার পদস্খলন হলে তার ত্রুটী সারবার মুহূর্তমাত্র সময় আর পাওয়া যাবে না। গড়াতে গড়াতে কোন্ অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে যে দেহটা পড়বে তার কোন ঠিকানা নেই। আর পতনের সঙ্গে সঙ্গে অস্থি-মাংস যে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কোথাও আবার পথ করতে হয়—ভাসমান বরফের স্তূপের উপর দিয়ে—তলায় থাকে লুপ্ত নদীর জলরাশি। বরফের চাঁই মাঝে মাঝে ফেটে যাচ্ছে দু'ফাঁক হয়ে। অতি সন্তর্পণে হাতের দণ্ডের আঘাত দিয়ে দেখে তারপর পা ফেলে ফেলে এগুতে হয়। ফাটলের মধ্যে একবার পড়লে—অদৃশ্য নদীর জলে চিরদিনের জন্য বিসর্জন।

একদিন সকালে সাঙ শিবির থেকে বেরিয়ে দলবল নিয়ে এগুচ্ছেন। চারিদিকে তুষারক্ষেত্রের ওপর প্রভাত রবির আলো পড়ে—ছটায় সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এক হাঁটু বরফ ঠেলে অতি কষ্টে চলেছে সবাই সামনের পথে। অকস্মাৎ বাজের আওয়াজের মতো এক শব্দে সবাই আতঙ্কে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পথের মাঝে। অবাক বিস্ময়ে তারা দেখল যে সম্মুখের বরফের স্তূপ একমুহূর্তে চিড় খেয়ে দু ফাঁক হয়ে গেল। তার পরক্ষণেই আবার সেই জায়গাটা জোড়া লেগে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। সাঙ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই বরফের চাঁই এক নিমেষে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে যেন রাক্ষসের মতো এক বিরাট হাঁ করে মুখের মধ্যে পুরে নিল, সাঙের মন এক অদ্ভুত বেদনায় ছেয়ে গেল। তিনি দেখলেন সেই অসহায় জীবগুলি কী ভাবে নিবিড় তুষারস্তূপের মধ্যে নিমেষে কবরায়িত হয়ে গেল। কিন্তু কি অসহায় তিনি নিজেও—এ ব্যাপার তিনি স্বচক্ষে দেখেও কই কিছুই তো করতে পারলেন না। আর করবেনই বা কী? বরফের রাশি ঘেঁটে সরান সেওতো এক অসম্ভব ব্যাপার। দারুণ ব্যথায় তাঁর অন্তর মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন তাঁর সঙ্গীদের তিনি বিদায় দেবেন। তাঁর জন্যে এই মানুষগুলির কেন এত কষ্টলাভ। তিনি তাঁর সঙ্গীদের অনুরোধ করলেন বার বার করে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যেতে। কিন্তু সেই সঙ্গীদল কিছুতেই তাঁকে একলা ফেলে যেতে চাইল না।

আর একদিন সন্ধ্যায় এক টুকরো সমতল ক্ষেত্র দেখে তাঁরা করেছেন সেখানে শিবির স্থাপন—উদ্দেশ্য সেখানে রাত কাটান। রাতে উঠল দারুণ ঝড়—বরফের রাশি উড়িয়ে ভীষণ বেগে। শিবিরের উপর বরফ স্তূপীকৃত হতে লাগল। ক্রমশঃ চাপ বাড়তে লাগল ভীষণভাবে, বিপদ বুঝে কয়েকজন অনুচর সেই তুষার-ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল নতুন জায়গার সন্ধানে। সারা রাত কেটে গেল কিন্তু

তারা আর শিবিরে ফিরে এলো না। সকালে ঝড় থামলে শিবির থেকে সবাই বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল তাদের মৃতদেহ। বরফের রাশির ভিতর থেকে কারুর শুধুমাত্র পাটুকু দেখা যায় অনাবৃত— কারুর বা শুধু পোষাকের অংশটুকু। সাঙ দেখলেন তারা সবাই মরেছে তুষার-ঝড়ের আক্রমণে। আবার তিনি তাঁর সঙ্গীদের ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন বিশেষ ভাবে। কিন্তু তারা সাঙকে জানিয়ে দিল যে তাদের হৃদয়ের শেষ স্পন্দনটুকু থাকতেও তারা কেউই তাদের কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যাবে না। এইভাবে এগুতে এগুতে একদিন তাঁর একখানা শিবিরই গলে-পড়া তুষার-স্রোতের নীচে পড়ে বরফের স্তূপের ভিতর ডুবে গেল। বিশেষ সৌভাগ্য যে তিনি নিজে সে শিবিরে ছিলেন না। সেবারও তাঁর বহু রসদ আর অনুচর বিনষ্ট হল। এদের মৃত্যুতে বার বার তিনি মনে আঘাত পেতে লাগলেন দারুণভাবে—কিন্তু তবুও ফিরে যাবার কথা একবারও তাঁর মনে এল না। তিনি দৃঢ়পণ করে—সব রকমে মরণকে তুচ্ছ করে—তিয়ানসানের চূড়াগুলি পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলতে লাগলেন। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তিনি এসে পড়লেন তিয়ানসানের এপারে—পশ্চিম তুর্কীস্তানের বহুবিখ্যাত খানের রাজত্বে। তিয়ানসান পার হতে গিয়ে সাঙ হারালেন তেরোজন সঙ্গী, বহু অশ্ব অশ্বতর আর রসদ।

ছয়

মরণসঙ্কুল তিয়ানসান। শেষকালে সেও মাথা নীচু করতে বাধ্য হল হিউয়েন সাঙের বিশ্বজয়ী ইচ্ছার কাছে। তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তাকে এড়িয়ে এলেন—একেবারে পশ্চিম পারে—পশ্চিম তুর্কীস্তানের খানের রাজত্বে। তখন চলছে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ। তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন প্রায় এক বছর আগে। এক গোবি আর তিয়ানসান পার হতেই তাঁর কেটে গেছে এই কয় মাস।

এপারে এসে সাঙের চোখে পড়ল এক প্রকাণ্ড হ্রদ—ইসিককুল। মাঝে মাঝে বাতাসে এর জলরাশি আন্দোলিত হচ্ছে। ইসিককুলের জল আবার উষ্ণ। সাঙ আর তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের শীতকাতর দেহগুলিকে ডুবিয়ে দিলেন ইসিককুলের উষ্ণ জলে। বহুক্ষণ ধরে তাঁরা অবগাহন করলেন ইসিককুলের জলে। তিয়ানসান পার হতে সাঙের শরীরে যত অবসাদ আর ক্লান্তি জমা হয়েছিল—কে যেন নরম এবং গরম আলিঙ্গনে তা এক নিমিষে মুছে নিল। তিনি অনুভব করলেন তাঁর দেহের প্রতিটী কোষ যেন আবার নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। তিনি দেহে আর মনে পেলেন অসীম ক্ষমতা।

সাঙ যে সময়ে ইসিককুলের তীরে পৌঁচেছেন ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমে তুর্কীস্তানের শাসনকর্তা বিখ্যাত খান ইসিককুলের অপর পারে তাঁর বহু সৈন্য সামন্ত, মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে শিবিরস্থাপন করেছেন—উদ্দেশ্য শীকার করা। ইসিককুলের অপর পারে দৃষ্টি দিয়ে সাঙ দেখলেন কেবল নদীর ঢেউয়ের মতো শিবিরশ্রেণী। সাঙ তাঁর আসার খবর পাঠালেন খানের কাছে। আর খান সঙ্গে সঙ্গে সাঙকে জানালেন সাদর সম্বর্দ্ধনা। বহু লোক-লস্কর গিয়ে সাঙকে

বহু সম্মানে এনে হাজির করল খানের বস্ত্রাবাসে। হিউয়েন সাঙ তো সামান্য বস্ত্রগৃহের সাজসজ্জা দেখেই অবাক। বিরাট এক প্রাঙ্গন ঘিরে খানের শিবির বিরাজমান। আর তার চারিদিকে ঝুলছে বহুমূল্য অলঙ্কারের কাজ। তাদের ওপর সূর্যের আলো পড়ে এখন তখন ধাঁধিয়ে দিচ্ছে দর্শকদের চোখ—তাদের ঝলমলানিতে। এ যেন তিয়ানসানের তুষারমৌলি চূড়ায় সূর্যোদয়। সাঙ বুঝলেন যে খান যদিও কয়েকটী যাযাবর জাতির সর্দার তবু তাঁর প্রতিপত্তি, তাঁর রাজকীয় সম্মান ও আড়ম্বর অন্য কোন রাজার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম তো নয়ই উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও বেশী।

সাঙ খানের রাজসভায় প্রবেশ করে খানের দীর্ঘজীবন কামনা করে এক স্বস্তিবাচন করলেন। তারপর তুরফানের রাজা যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন সেগুলি খানকে উপহার দিলেন। খান একেতো সাঙের প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্তি দেখে আর মধুর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েই ছিলেন তার ওপরে এই সব নানান জিনিষ উপহার পেয়ে ভারী খুশী হয়ে উঠলেন। তিনি সাঙকে তাঁর কাছে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার অনুরোধ করে তাঁর বস্ত্রাবাসের কাছে একটী অতি সুসজ্জিত বস্ত্রগৃহে সাঙের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিয়ানসান পার হতে সাঙ ক্লান্ত হয়েছিলেন বড় কম নয়। কিছুদিন তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল পরিপূর্ণ বিশ্রামের। এ সুযোগ পেয়ে তিনি রীতিমতো আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

একদিন খান শিকারে গিয়ে মেরে আনলেন এক বিরাটকায় মৃগ। সভাপরিষদরা সবাই খুব খুশী—খানও নিজে বিশেষ খুশী। এই সময়ে সাঙ বসেছিলেন দরবারকক্ষে। মৃত মৃগটীকে দেখে তাঁর চির অহিংস করুণাময় মন কেঁদে উঠল। তিনি ছলছল চোখে খানকে বললেন—মহারাজাধিরাজ আপনি একজন পরাক্রমশালী শত্রুজিৎ বীর।

আপনি সামান্য একটু আনন্দের জন্য এ প্রাণীটির প্রাণবধ করেছেন দেখে আমি অন্তরে অতিশয় দুঃখ পেয়েছি। এ অসহায় মৃগ তো আপনার কোন অপকারই করেনি। আপনার মত বীরের কি উচিৎ এই নিরীহ প্রাণীটিকে হত্যা করা? আর ভেবে দেখুন মহারাজ আপনি কাকে হত্যা করেছেন। এই যে জীব—এর শরীরে যে প্রাণ, যে অনুভূতি—তাতো আপনার আমার শরীরেও আছে। বিশ্বস্রষ্টার পুত্র আপনি যেমন তেমনি এই মৃগটীও। তবে এ হিংসা কেন? ভগবান তথাগত বলেছেন—হিংসা থেকেই পাপের সৃষ্টি আর এই পাপই হয় মানবের সকল রকম জাগতিক দুঃখের কারণ। অতএব আপনি এ হিংসা বর্জন করুন। বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র অন্তরে ধারণ করে জগতের প্রত্যেক জীবের প্রতি পোষণ করুন করুণা আর প্রেম। একমাত্র এই পথেই আছে আপনার মঙ্গল—মনের যাবতীয় শান্তি।

হিউয়েনসাঙের এ উপদেশ—খানের মনে যেন জ্বলন্ত অক্ষরে এক নিমেষে লেখা হয়ে গেল। তিনি সাঙের পায়ের নীচে মাথা পেতে দিলেন—নিলেন সদ্ধর্মে দীক্ষা। তাঁর পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি হল বুদ্ধের চতুর্বর্গ শিষ্য। তবে খানও শেষ পর্যন্ত তুরফানের রাজার মতো মতলব করলেন সাঙকে তাঁর রাজসভায় আটকে রাখবার। একদিন তিনি বললেন—প্রভু! আপনি ভারতবর্ষে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করুন। কারণ আপনার এই বাসনায় আমার মন অত্যন্ত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। যদিও ভারতে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন—আর সেই হিসাবে ভারত অতি পবিত্র স্থান—তবুও তার বেশীর ভাগ জায়গাই হল কৃষ্ণকায় অনার্যদের দ্বারা অধ্যুষিত। এই সব অনার্য-বর্বরদের হাতে পড়লে আপনার প্রাণহানির থাকবে সমূহ সম্ভাবনা। তারপর ভারত হল অত্যন্ত বন্য জায়গা। সেখানে বহু যোজনব্যাপী বন জংগল চারিদিকে ঢেকে আছে। সে সব জংগলও আবার বিশেষভাবে

শ্বাপদসঙ্কুল। হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ! কেন আপনি এ নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে ভারতে যাবেন? সেখানে না আছে দেখবার মতো কোন রমণীয় দৃশ্য না আছে বাস করার মতো একটু ভাল জায়গা। ভারতের আবহাওয়াও ভীষণ গরম। আপনি কি সেখানে টিঁকে থাকতে পারবেন? অতএব আমার অনুরোধ রাখুন। আপনার যাত্রা স্থগিত করুন।

সাঙ পূর্বেরই মতো তাঁর অটল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। তবে সাঙের ভারতে যাবার ইচ্ছা একান্ত সুতীব্র দেখে খান আর তাঁকে কোন রকম পীড়াপীড়ি করলেন না। নিজেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ভারতবর্ষে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে লাগলেন। তখনই ডাক পড়ল পারদর্শী দোভাষীর। খান তাঁকে আদেশ করলেন গান্ধার রাজ্যের কয়েকজন ছোট ছোট শাসকের কাছে পরিচয়পত্র লিখে দেবার।

চিঠি লেখা শেষ হলে খান বললেন—মহাস্থবির হিউয়েন সাঙ যাচ্ছেন ভারতবর্ষে। তুমি এঁকে সঙ্গে করে কাবুল নদীর উপ-ত্যকায় কপিশ দেশ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেবে। পথে যেন তাঁর ভাষা না জানার দরুণ কোন কষ্ট পেতে না হয়।

খানের বস্ত্রাবাসের আরাম আর প্রাচুর্যভরা দিন সাঙ একদিন শেষ করলেন—নেমে এলেন আবার পথে। পিছনে ফেলে এলেন পশ্চিম তুর্কীস্থানের এলাকা। এবার তিনি চলতে লাগলেন দক্ষিণ পশ্চিম দিক ধরে।

পথের অসুবিধা আর বিশেষ কিছু নেই। সঙ্গে দোভাষী থাকায় সুবিধাও হয়েছে প্রচুর। আর রসদ যা তুর্কীস্তানের খান সঙ্গে দিয়েছেন তা পর্যাপ্ত। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এসে পঁড়লেন শাশ্ সহরে। এই শাশ্ এখন নাম পেয়েছে তাস্খন্দ্। এর কিছু দক্ষিণেই হল সমরখন্দ্ সহর। তিনি তাস্খন্দ্ ছেড়ে কিছু

দিনের মধ্যেই এলেন সমরখন্দে। এই সমরখন্দ্‌ ছিল তখনকার সময়ে চীন আর পারস্যের মধ্যে বাণিজ্যপথের শেষ প্রান্ত। এখানে এসে তাই বাঁসা বেঁধেছে মাঝ এশিয়ার নানান জায়গা থেকে আসা বড় বড় বণিকের দল। এসেছে চীনা সওদাগররা। অসংখ্য অশ্ব, অশ্বতর, উট আর গাধার পিঠে বোঝাই দিয়ে এসেছে—নানা রকমের সার্টিন, পশু লোমের জামা, বহু কারুকার্যখচিত সুদৃশ্য কার্পেট, পশম আর রেশমের উপর কাজ করা হরেক রকমের বাহারী কাপড়-চোপড়। আর এসেছে বস্তা বস্তা শুকনো খেজুর, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, মেওয়া। সওদাগরদের কেউ কেউ যাবে পারস্য, কেউ চলেছে গান্ধার হয়ে ভারতবর্ষ, আবার কেউ বা চলেছে পারস্য, তুরস্ক পার হয়ে, ককেসাস ডিঙ্গিয়ে সুদূর রোমক সাম্রাজ্য পর্যন্ত। সাঙ এখানে এসে দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা করলেন। সন্ন্যাসী সাঙের দৃষ্টি ছিল কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে এখানকার ধর্মের ওপর। সাঙ যখন পারস্যের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন সেখানকার আর্যদের ধর্ম ছিল জরথ্‌ষ্টের ধর্ম। আমাদের দেশে যাদের আমরা এখন পার্শী সম্প্রদায় বলি—আদিম পারস্যবাসীরা হল তাদেরই পূর্বপুরুষ। তাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন অগ্নিদেব। তারা অগ্নিতে নানান দ্রব্যসামগ্রী ও পশু আহুতি দিয়ে অগ্নির পূজা করত। তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল 'জেন্দা-বেস্তা'। মহাজ্ঞানী জরথ্‌ষ্ট ছিলেন এই ধর্মের প্রবর্তক। পরে নানা কারণে পারস্যের অধিবাসীরা ভারতে প্রবেশ করে। আজ আর পারস্যে অগ্নিউপাসীদের সন্ধান পাওয়া যায় না বটে—তবে এ ধর্ম এখনও বেঁচে আছে ভারতের পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

সাঙ এদের ধর্ম দেখে নিতান্ত দুঃখিত হলেন। তিনি দেখলেন এদেশের রাজা থেকে পামর জনসাধারণ পর্যন্ত এই ধর্মে বিশ্বাসী। তারা জীবন্ত পশু আগুনে বলি দিয়ে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারে। তারা বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম একেবারেই মানে না। তাই এ দেশও

সাঙের খুব বেশী পছন্দ হল না। তিনি পারশ্য ত্যাগ করে একেবারে দক্ষিণ দিকে পা চালালেন।

চলতে চলতে তিনি পার হয়ে এলেন সাহর্-ই-সব্জ্ সহর। সাঙ এই সহরকে বলেছেন সিয়ে-স্যুয়াঙ্-না। এই সহরের সীমানা পার হলেই পড়ে কোটিন্-কো পর্বতমালা। পামীরের মালভূমিকে ঘিরে যে একটী পর্বতমালা সারবন্দী প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে— তাদেরই একটী বিচ্ছিন্ন শাখা হল এই কোটিন-কো। আবার সুরু হল সেই পাহাড়ে পথ। কিন্তু তিয়ানসান পার হয়ে এসেছেন যে সাঙ, তিনি এই পাহাড়ে চড়ার কষ্টকে আদবে গ্রাহ্যই করলেন না। এখানকার পাহাড়ে রাস্তাও কিছু মাত্র আরামের নয়। সে পথ যেমনই খাড়া তেমনি উঁচু। প্রত্যেক পথের বাঁকে যেন বিপদ অপেক্ষা করে থাকে নানা রকম ছদ্মবেশে। এই কোটিন-কোর আবার বিশেষত্ব এই যে এর শৃঙ্গগুলি হল একেবারেই নাঙ্গা। এখানে না জন্মায় কোন গুল্ম-লতা-গাছ, না পাওয়া যায় কোন ঝরণার সন্ধান। কঠিন পাথরের গা কোথাও বা মসৃণ কোথাও বা উপল-বিষম। পা রাখবার বা ভর দিয়ে পাহাড় চড়বার মতো অনুকূল জায়গা এখানে একটুও পাওয়া যায় না। এমন পাহাড়ের গায়ে পা রেখে সাঙ চলতে লাগলেন অতি সন্তর্পণে। ক্রমে ক্রমে তিনি এসে পড়লেন দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা সরু পথের মধ্যে। এই পথ ধরেই তিনি অন্ধের মতো এগুতে লাগলেন সামনের দিকে। তিনশ লি পথ অতিক্রম করার পর তিনি এসে পড়লেন ‘লৌহ তোরনের’ কাছে। এই লৌহতোরনের ভিতর দিয়ে সেই প্রাচীন কালের রাস্তাটী আজও চলে গিয়েছে সমরখন্দ্ থেকে বক্ষু নদীর উপত্যকা পর্যন্ত। এই রাস্তা দিয়ে সাঙের সময়েও যেমন সওদাগরদের দল অশ্ব, অশ্বতর উট আর গাধার বাহিনী সাজিয়ে পণ্য নিয়ে যাতায়াত করত দেশে বিদেশে—আজও ঠিক তেমনিই তারা চলে বাণিজ্যের

উদ্দেশ্যে। এই রাস্তাটী চলে গেছে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ে খাদের ভিতর দিয়ে।

ছুদিকে পাহাড়ের খাড়াই উঁচু দেওয়াল। ডাইনে বাঁয়ে তাকালেই চোখে পড়ে গগনচুম্বী পাহাড়ের শ্রেণী আর তাদের নীচে এই অতল-স্পর্শী খাদ। আর তারই বুক চিরে চলেছে এক ফালি সরু রাস্তা। সে রাস্তাও আবার যেমন উপলবিষম তেমনি তার প্রাণঘাতী চড়াই। এই পথটীর ছুদিকে যে পাহাড়ের শ্রেণী অনন্তকাল ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের সাক্ষীর মতো তাদের গায়ের রং দেখতে ঠিক লোহার মতো। এর কারণ হল এখানকার পাথরে লোহার ভাগ অত্যন্ত বেশী। এই সরু পথটীর প্রবেশের মুখে আছে লোহার তোরণ দ্বার আর তাদের গায়ে ঝোলান আছে অসংখ্য লোহার ঘণ্টা। সেই জন্যই এই পথের নাম লৌহ-তোরণ। এই বিখ্যাত পথটী তখন ছিল পশ্চিম তুরস্কের শেষ সীমানা। এই তোরণে পাহারা বসিয়ে তুরস্করা মাঝ এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে যাবার পথে যানবাহন ও লোকচলাচল নিয়ন্ত্রণ করত।

সাত

লৌহ-তোরন নির্বিঘ্নে পার হয়ে সাঙ পথ ধরলেন দক্ষিণমুখী। কিছু দূরে এসেই তিনি দেখলেন এক নদী তার স্বচ্ছ নীল ধারা নিয়ে তর তর বয়ে চলেছে। এ হল এখনকার আমুদরিয়া—যাকে প্রাচীন ভারতীয়েরা নাম দিয়েছিলেন বক্ষু। আর ইউরোপীয়েরা যাকে ডাকত অক্সাস্ (oxus) বলে। তিনি বক্ষু অতিক্রম করে এলেন। তারপর সমরখন্দ্ আর বাল্খের পথ ছেড়ে দিয়ে চলতে লাগলেন ব্যাক্ট্রিয়ার দিকে।

ব্যাক্ট্রিয়া হল ইরান দেশের একটা জায়গা। এর নাম বহু প্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে আছে জ্বলন্ত অক্ষরে। বিশেষ করে এর সভ্যতা, এর কৃষ্টি ও মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে এর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে কোনদিন মুছে যাবার নয়। হিউয়েন সাঙ যখন ব্যাক্ট্রিয়ায় আসেন তখন তার শাসনকর্তা ছিলেন টার্হ্সাদ। এই টার্হ্ হলেন পশ্চিম তুর্কীস্তানের খানের পুত্র আর তুরফান রাজের ভগ্নীপতি। টার্হ্সাদ তখন বাস করছিলেন কুণ্ডুজ্ সহরে। টার্হ্ ছিলেন যেমন বীর তেমনি ধার্মিক ও মহদাশয়। তিনি সাঙের আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁকে অতি সমাদরের সহিত এগিয়ে নিয়ে এলেন নিজের বাসভবনে। সাঙ তাঁকে জানালেন তাঁর পিতা খানের আর আত্মীয় তুরফান রাজের কুশল সংবাদ। রাজার আতিথ্যে সাঙ কুণ্ডুজে কিছুদিন পরম বিশ্রামের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। সাঙের অভিপ্রায় শুনে টার্হ্'র মনেও এক আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান দেখে আসার।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর তার অদৃষ্ট রচনা হয় আর এক ভাবে। ইতিমধ্যে টার্হ্ সাদের প্রথমা মহিষী এক রোগে অকস্মাৎ পরলোক

গমন করলেন। আর টার্দু পুনরায় পাণিগ্রহণ করলেন অপর এক সুন্দরীর। এই দ্বিতীয়া মহিষীর বাহিরের চেহারা ছিল যেমন রূপলাবণ্যময়ী ভিতরটা ছিল তেমনি কুৎসিত। তিনি টার্দুকে বিয়ে করার পরেই রাজপ্রাসাদে গুপ্তভাবে মিলিত হতে লাগলেন টার্দুর প্রথমা মহিষীর এক পুত্রের সঙ্গে—এবং তার কণ্ঠলগ্না হলেন। হীন ষড়যন্ত্র চলতে লাগল টার্দুর অগোচরে। শেষে একদিন টার্দুর পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার অভিপ্রায়ে নিষ্ঠুরা মহিষী টার্দুকে হত্যা করলেন বিষ প্রয়োগে। ধার্মিক উদারমনা টার্দুসাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দেখার সাধ চিরদিনের জন্যে অতৃপ্ত রয়ে গেল।

সিংহাসনে বসলেন টার্দুর পুত্র। রাজপ্রাসাদের এই সব গোলমালের মধ্যে সাঙ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—নতুন রাজা তাঁকে আবার কী চক্ষে দেখেন। কিন্তু নতুন রাজা সাঙের সঙ্গে কোন রকম বিরূপ ব্যবহার তো করলেনই না। উপরন্তু টার্দু তাঁকে যেমন আদর আপ্যায়ন করতেন ঠিক সেই রকমই করতে লাগলেন। তিনিও তাঁর পিতার মতো সাঙকে আশ্বাস দিলেন কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত সাঙকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেবার। ইতিমধ্যে তিনি একবার সাঙকে নিমন্ত্রণ জানালেন বাল্‌খ সহর পরিদর্শন করতে।

বাল্‌খ তখন ছিল ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশের রাজধানী। এই বাল্‌খই অবশ্য প্রাচীন কালে নাম পেয়েছিল ব্যাকট্রিয়া। হিউয়েন সাঙ টার্দুসাদের পুত্রের সঙ্গে বাল্‌খ দেখতে গেলেন। সেখানে যে ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে আগে আকর্ষণ করল তা হল বাল্‌খএর অধিবাসীদের অদ্ভুত আচরণ। তারা সবাই ওপরে বৌদ্ধ হলেও মূলে তারা রয়ে গেছে যে-ইরাণী সেই ইরাণী। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ঘটে প্রথমে রাজা অশোকের সময়ে। তারপর আশী খৃষ্টাব্দে মহারাজ কনিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এখানে জনসাধারণের ধর্ম্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউয়েন সাঙ লিখলেন—এস্থান অতিশয় সুজলা,

সুফলা, শস্য শ্যামলা। এর সন্নিকটে যে উপত্যকা আছে তার উর্বরতা অসাধারণ। এ জায়গাটী অতি সুন্দর। এখানে একবার এলে প্রত্যেক লোকেরই যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"
কিন্তু সাঙের লেখনীতে যে স্থান বর্ণনায় এত রমণীয় বলে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে—সে জায়গায় এখন বিরাজমান উষর, জনহীন, সবুজের চিহ্নবিহীন, ধূ-ধূ বালির রাশি। কবে যে এর নদী ও খাল সব শুকিয়ে গেল, কবে যে মরুভূমি আস্তে আস্তে তার ভয়ংকর শুষ্ক রসনা বিস্তার করে এমন সুন্দর জায়গাটীর সবুজ রস সব শুষে নিল তা সঠিক কেউ বলতে পারে না। তারপর হুনদের অত্যাচারে মুসলমান আর মঙ্গোলদের ধ্বংসময় আক্রমণে ধীরে ধীরে এর অধিবাসীরাও অতিষ্ঠ হয়ে ত্যাগ করেছে এর সান্নিধ্য। শুধু মহাকালের সাক্ষীর মতো আজও দাঁড়িয়ে আছে সে যুগের রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে বৌদ্ধ স্তূপ—যাদের গায়ের কারুকার্যগুলি পর্যন্ত উপড়ে নিয়ে গেছে মুসলমান আর মঙ্গোলরা। সাঙ যখন বাল্‌খ দেখতে গিয়েছিলেন—বর্ব্বর হুনদের অত্যাচার সত্বেও তখনও সেখানে টি ঁকে ছিল একশত সংঘারাম। সেই সংঘারামগুলিতে শ্রমণ সংখ্যা ছিল প্রায় তিনসহস্র। আর ছিল বৌদ্ধধর্মের বহু অমূল্য গ্রন্থাদি। এই সব শ্রমণরা ছিলেন হীনযান সম্প্রদায়ের কিন্তু তা সত্বেও তাঁদের সঙ্গে সাঙের ধর্ম সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য ঘটেনি। সাঙ লিখেছেন—বাল্‌খ যে শুধু সংঘারাম, স্তূপ আর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদির জন্য বিখ্যাত ছিল তা নয়, তখন বাল্‌খে বাস করতেন সত্যিকারের জ্ঞান তপস্বীরা। এই সব জ্ঞানী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাঙের ধর্ম সম্বন্ধে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজনের নাম সাঙ অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। ইনি হলেন প্রজ্ঞাকার। এই প্রজ্ঞাকারই সাঙকে হীনযান ধর্মের—অভিধর্মকোষ, কাত্যায়নকোষ ও বিভাস শাস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মূল গ্রন্থের কঠিন সূত্রের মীমাংসা করে দেন।

আট

বাল্‌খ্‌ ছেড়ে সাঙ আবার পথে নামলেন। কিছুদূর এসে এবার তাঁর পথরোধ করল তুষারমৌলী হিন্দুকুশ। কিন্তু যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির কাছে গোবির ভীষণতা হয়েছে তুচ্ছ, তিয়ানসানের সু-উচ্চ শির হয়েছে নত—সেই ইচ্ছাশক্তিই তাঁকে আবার সাহায্য করল হিন্দুকুশ পার হতে।

হিন্দুকুশের চূড়াগুলিতে চির-তুষারের রাজত্ব। সে দৃশ্য যেমন মহিমময় তেমনি ভয়ংকর। সেখানে সূর্যের আলো পড়ে এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে যেন হাজার হাজার বাতির রোশনাই· সাঙের চোখ ধাঁধিয়ে যায়—ঝলসে যায়। কিন্তু পথ তো এর ভিতর থেকেই করতে হবে। সাঙ হিন্দুকুশের নাম দিলেন 'তুষার-পর্বত'। তুষার ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এই তুষার এক এক জায়গায় পেঁজা তুলোর রাশির মতো হাল্‌কা, ঝরঝরে। আবার এক এক জায়গায় রূপোর পাতের মতো ঝক্‌ ঝকে, বজ্রকঠিন। দেখতে দেখতে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে উঠে। হিন্দুকুশের চূড়াগুলিও আদবে সুগম নয়। তিয়ানসান আর গোবির মধ্যে সাঙ যে বিপদে পড়েছিলেন হিন্দুকুশের কষ্টও তার কিছুমাত্র কম ছিল না। দুরন্ত গতিতে বয়ে যাচ্ছে তুষার ঝটিকা। এ এক প্রাণঘাতী ব্যাপার। চোখের সামনে তাঁর এসে জমছে রাশি রাশি মেঘ—আসছে ধোঁয়ায় দশ দিক অন্ধকার করে। সেই মেঘের রাশিই আবার তাঁর চোখের সম্মুখে জমে জমাট বাঁধছে শক্ত তুষারের রূপে। তারপর ভয়ংকর শব্দে দিগ্বিদিগে প্রতিধ্বনি তুলে সেই তুষার-স্তূপ ভেঙ্গে পড়ছে মাঝে মাঝে। গলিত স্রোতে সেই স্তূপ আসছে ভেসে দারুণ গতিতে। তার নীচে পড়লে এক মুহূর্তে জীবন্ত সমাধি।

ভগবান বুদ্ধের নামকে সম্বল করে সাঙ সেই সব দুর্যোগে ভরা পাহাড়ে পথ টপকে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন। শেষে দান্দানসিকান আর কারাকোট্রল গিরিপথ দিয়ে তিনি এসে পৌঁছালেন বামিয়ানে।

বামিয়ান সে দিনও যেমন ছিল আজও তেমনি মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যপথের অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। সেদিন হিউয়েন সাঙ বামিয়ান দেখে যা লিখে রেখে গিয়েছিলেন আজও তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে আছে।

সাঙ লিখেছেন—বামিয়ান সহরটি যেন উত্তরদিকের খাড়াই উঁচু পাহাড়ের গায়ে উপত্যকা অতিক্রম করে হেলান দিয়ে ঝুলে আছে। এর পরিধি হল ছয় কী সাত লী। এখানে শীতের শস্য প্রচুর জন্মায়—কিন্তু ফল ফুলের প্রাচুর্য এখানে নেই। বামিয়ানে শীত হল প্রচণ্ড। এখানকার অধিবাসীদের অঙ্গে পশু লোমের জামা। আচার ব্যবহার—অতি রুক্ষ, রূঢ় ; প্রকৃতি—নিষ্ঠুর ও দুর্দ্ধর্ষ। এই সব দৃপ্ত পার্বত্যজাতির লোকেরাই হল এখানে বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক।

এই সব লোকেরা ভিক্ষু সাঙকে পরম আদর ও যত্নে স্থান দিয়েছিল—দিয়েছিল তাদের আতিথ্য। সাঙ যখন বামিয়ানে যান তখন সেখানে ছিল দশটি বৌদ্ধ বিহার। সেখানে বাস করতেন কয়েক সহস্র হীনযান বৌদ্ধ। সাঙ বামিয়ানের দুটি প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্তি দেখে বিস্মিত হন। এর একটির উচ্চতা হল একশ সত্তর ফিট, অপরটির একশ পনেরো ফিট। এই দুটী মূর্তির একটি আজও বামিয়ানের পাহাড়ের চুড়ায় রয়েছে। অপর মূর্তিটি আর অনান্য বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলি কুখ্যাত চেঙ্গিসের ধ্বংসময় অভিযানে বিধ্বস্ত।

বামিয়ান পিছনে রেখে এগিয়ে চললেন সাঙ সম্মুখের পথে—অবিচলিত গতিতে ঘোড়বন্দ নদীর বঙ্কিম উপত্যকার পথে। ঘোড়বন্দ হল কাবুল নদীর একটা শাখা। তিনি ঘুরপথে এগিয়ে চলতে লাগলেন। তারপর যেখানে ঘোড়বন্দ এসে পানশিরের সঙ্গে মিশেছে—সেখানে এসে সাঙ দেখলেন তাঁর দুপাশে উঁচু দেওয়ালের মতো পাহাড় শ্রেণীর যেন হঠাৎ হল অবসান। আর তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল বিস্তৃত এক সুন্দর সমতল ভূমি। এই হল কপিশ দেশ।

কপিশ দেশের অবস্থান হল কাবুলের ঠিক উত্তর দিকে। এর রাজধানীর নাম হল কাপিশী। পানশির নদীর ধারে বর্তমানে বেগরাম বলে যে গ্রামখানি আছে তারই সন্নিকটে ছিল এই কাপিশী।—ঘোড়বন্দ আর পানশিরের তুষারগলিত জলধারায় এই স্থান প্লাবিত। তাই এ দেশ এতো সমৃদ্ধ, উর্বর। এখানকার জমি রবিশস্য ও ফল চাষের বিশেষ উপযোগী। তাই এখানে স্থানে স্থানে চোখে পড়ে বিরাট বিরাট দ্রাক্ষাকুঞ্জ রসাল ফলে ভরা। এখান থেকে আঙ্গুর আর কিস্‌মিস্‌ ভারতবর্ষে চালান যায়। এর আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম। কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে যে উত্তুরে হাওয়া বয় তাতে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তা সত্বেও এখানে দেবতার আশীর্বাদ আছে—আর আছে বহু ধর্মপ্রতিষ্ঠান।

কাপিশী ছিল কুশানরাজ কনিষ্কের গ্রীষ্মাবাস। এখানকার শাসকএর-সম্বন্ধে সাঙ লিখেছেন—রাজা হলেন প্রকৃত বীর। এঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে আশপাশের রাজাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ইনি এক সঙ্গে বারটি রাজ্য শাসন করে থাকেন। এই রাজা ছিলেন বুদ্ধের একজন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। তিনি যথেষ্ট সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন হিউয়েন সাঙকে।

সপ্তম শতকে কাবুল ছিল বৃহত্তর ভারতের একটা অংশ। সেইজন্য এইখানে এসে সাঙ প্রথম সন্ধান পেলেন জৈন ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের। জৈন সন্ন্যাসীরা পার্থিব সব কিছুর ওপর বীতস্পৃহ—তাই তারা দিগম্বর। হিন্দুরা উদাসীন। তাদের অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, গলায় নরকরোটির মালা। কিন্তু জনসাধারণের বেশীর ভাগটিই হল বৌদ্ধ। এই কাপিশীতে রাজার পৃষ্টপোষকতায় পাঁচদিনব্যাপী এক বৌদ্ধ সভার আয়োজন হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিরোধ দূর করার। সাঙ এ সভায় যোগ দেন এবং তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে বহু পণ্ডিতকে মুগ্ধ করেন।

নয়

৬৩০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা হিউয়েন সাঙ কাটালেন কাপিশীতে। তারপর একদিন গ্রীষ্মশেষে কাপিশীকে পিছনে রেখে পা বাড়ালেন প্রাচ্যের পথে। কাবুল নদীর গতি অনুসরণ করে তিনি নিজের গতিপথকেও চালালেন সেই মুখে। ক্রমে লম্পক প্রদেশকে কাবুল নদীর বাঁ-ধারে ফেলে এসে হাজির হলেন নাগরাহারা নামে বিখ্যাত সহরে। এই লম্পকের এখনকার নাম হল লমখান আর নাগরাহারা নাম পেয়েছে জলালাবাদ। তারপর ক্রমশঃ ধাপে ধাপে পাহাড়ে মালভূমি দিয়ে নামতে লাগলেন সাঙ নীচের দিকে। পিছনে ফেলে আসতে লাগলেন খাদের পর খাদ। ক্রমশঃ শীত একটু একটু করে কমে আসতে লাগলো। বাতাস ঈষদুষ্ণ ও ক্রমে বেশ গরম হয়ে এলো। সাঙ নেমে আসতে লাগলেন তাল খেজুর আর কমলা-কুঞ্জের ভিতর দিয়ে। কোথাও পথে পড়ল ধানের ক্ষেত কোথাও বা আখের। দু'পাশের জঙ্গল থেকে কানে ভেসে আসতে লাগলো অজস্র ময়নার কলকাকলি। বানরদের কিচির-মিচির ডাক। সাঙ বুঝলেন এবার তিনি সত্যই ভারতের বুকে এসে পড়েছেন। সাঙ লিখলেন—এখানকার মাটী ধান চাষের বিশেষ উপযুক্ত। এখানে আখও জন্মায় প্রচুর। এর আবহাওয়া উষ্ণ ও আরামদায়ক। এখানে কুয়াশা জমে বটে—কিন্তু তুষার চোখে পড়েনা। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—এখানকার অধিবাসীরা বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটায়। এরা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়—কিন্তু এদের চরিত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসুলভ আচরণই বেশী। এরা সাধারণতঃ ভীরু এবং জুয়ায় আসক্ত। এদের নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি আচরণ বড়ই অভদ্র; রাস্তায় কেউ কাউকে পথ ছেড়ে দেয় না। আর পরস্পরের প্রতি

কুবাক্য প্রয়োগে এরা ভয়ানক অভ্যস্ত। সকলেরই পোষাক হল তুলার কাপড় এবং তা বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত। এদের আকৃতি ঈষৎ খর্ব্ব, প্রকৃতি কিছুটা চঞ্চল ও উৎসাহব্যঞ্জক।

আফগানিস্থানে বা প্রাচীন গান্ধারে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে গ্রীসদেশীয় ভাবধারার যে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তা আমি আগেই বলেছি। তার ফলে এখানে যে সমস্ত শিল্প সে সময়ে গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে একটা নতুন ধরণের শিল্পকারিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই নতুন শিল্প গান্ধার-শিল্প নামে বিখ্যাত। এখানকার ভাস্কর্যে, চারুকলায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতেও এর প্রতিফলন হয়েছে বেশ পরিস্ফুটভাবে। প্রাচীনের নাগরাহারা বা বর্তমানের জলালাবাদ হল এই সব ভাস্কর্য ও চারুকলার একটা বিশিষ্ট স্থান। মহারাজ অশোকের সৃষ্ট বিরাট বৌদ্ধস্তূপ ও গ্রীক-ভারতীয় কলার যাবতীয় নিদর্শন জলালাবাদকে আজও বিখ্যাত করে রেখেছে। বিশেষ করে জলালাবাদ থেকে কিছু দূরে হাদ্দা গ্রামে খোঁড়াখুড়ির ফবে যে সব মূর্তি এখন মাটির তলা থেকে বার হচ্ছে তা ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিরাট ঐশ্বর্যের বস্তু। হিউয়েন সাঙ যখন নাগরাহারা যান তখন ঐ সব কলা ও ভাস্কর্ষ ছিল মাটীর উপর। তিনি সেই অপূর্ব কলানৈপুণ্য দেখে হয়েছিলেন বিশেষ বিস্মিত ও মুগ্ধ। কিন্তু জলালাবাদ ছেড়ে পুরুষপুর বা আধুনিক পেশোয়ার সহরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল অন্যরকম।

সেই পুরুষপুর যা ছিল মহারাজ কনিষ্কের রাজধানী—গ্রীক-ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্মভূমি তার অবস্থা দেখে সাঙ বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। সাঙ পুরুষপুরে আসবার ঠিক এক শতাব্দী আগে মানব সভ্যতার শত্রু, ভারতের এ্যাটীলা, বর্বর হুন মিহিরকুল পুরুষপুর ধ্বংস করে এক করাল আঘাত হেনেছিল গান্ধার সভ্যতার মূলে। আর সে আঘাত ছিল এতই ভয়ংকর যে তারপর থেকে গান্ধার সভ্যতা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারল না। সাঙ লিখেছেন—এখান-

কার রাজবংশের উচ্ছেদ হয়েছে সমূলে। রাজ্য সংযুক্ত হয়েছে কপিশ দেশের সঙ্গে। এ সহরে লোক নাই। গ্রমেগুলিও জনশূন্য। কেবল মাত্র সহরের একটেরে বাস করে বোধ হয় হাজারখানেক গৃহস্থ। সহরের মধ্যে চোখে পড়ে কেবল ভেঙ্গে পড়া প্রায় লক্ষ বৌদ্ধবিহার। যে সংঘারামও বিহার থেকে এক সময়ে সহস্র কণ্ঠে—'বুদ্ধং শরণং' মন্ত্রে গান্ধারের আকাশ, বাতাস মন্ত্রিত হয়ে উঠত সেখানে আজ শোনা যায় কেবল নিশাচর পেঁচার আর্তনাদ। যে স্থান একদিন ছিল লক্ষ লক্ষ লোকের পদাঘাতে জীবন্ত সেখানে আজ গজিয়েছে বিকট জংগল —শ্বাপদ ও সরীসৃপকুলের বাসা।

পুরুষপুর ত্যাগ করে সাঙ এলেন উড্ডীয়ান সহরে। এখানেও তাঁর চোখে পড়ল হুনদের ধ্বংসময় অত্যাচারিতার বহু চিহ্ন। এখানে পূর্বে ছিল চৌদ্দশত বৌদ্ধবিহার আর সেখানে বাস করতেন প্রায়—আঠারশত বৌদ্ধসন্ন্যাসী। সাঙ দেখলেন সেই বৌদ্ধবিহারগুলির প্রায় সবকটাই বিধ্বস্ত। সন্ন্যাসীরা প্রায় সবাই সে স্থান থেকে পলাতক।

হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখলেন—উড্ডীয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে কিছুটা হল মহাযান বৌদ্ধ আর বাকী সবাই হিন্দু। কিন্তু সেখানকার মহাযান মতবাদীরা সাঙের মনে খুব বেশী স্থান পায়নি। তার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—এ সব মহাযানীরা হলেন কেবল নামেই হলেন, ধ্যানমন্ত্রের উপাসক। তারা কেবল মন্ত্র উচ্চারণ ও পাঠ করেই তাদের কর্তব্য শেষ করে। সেই সব মন্ত্রের অর্থ বা ভাবের গভীরে কেউই প্রবেশ করতে জানে না। এদের সবচেয়ে বড় নেশা হ'ল যাদুবিদ্যার চর্চা।

এই সময়েই হিমালয়ের নেপাল, ভূটান, তিব্বত প্রভৃতি অনেক-গুলি অঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধরা আশপাশের প্রচলিত হিন্দু শৈব-সম্প্রদায়ের সংগে মিলে যাদু, ভূত-প্রেত প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রাকৃত বিদ্যার চর্চা সুরু করেন। এদের সাধারণ ভাষার নাম দেওয়া

হয়েছিল তন্ত্র-শাস্ত্র। মহাযান মত সাঙের অতি প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সাঙ কিন্তু উড্ডীয়ানের মহাযান মতবাদীদের সঙ্গে কখনও একমত হননি। সেখানে তিনি বেশী করে অনুরক্তি দেখিয়েছেন হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতি।

উড্ডীয়ানে কিছুদিন বাস করার পর সাঙ এলেন বিখ্যাত তক্ষশীলা সহরে। তখনও তক্ষশীলার নাম ডাক প্রচুর—পাঞ্জাবের রাজধানী হিসাবে। তক্ষশীলার প্রথম নামকরণ হয় মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়ে—গ্রীকরাজ ট্যাক্সিলাসের নামানুসারে। তারপর মহারাজ অশোক তক্ষশীলাকে উত্তর পশ্চিম ভারতে ধর্মপ্রচারের একটা বড় কেন্দ্র হিসাবে তৈরী করে গেলেন। তক্ষশীলার অশোক স্তূপই হল তার প্রমাণ।

তক্ষশীলার বুকে পা দিয়েই হিউয়েন সাঙের মনে পড়ে গেল অশোকপুত্র কুনালের জীবনের সেই করুণ কাহিনী।

কুনালকে মহারাজ অশোক শাসক করে পাঠালেন তক্ষশীলায়। মহারাজ কুনালের বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁরই একজন অনুগ্রীহিতা নারীর কন্যার সঙ্গে।

এদিকে কুনালের রূপে মুগ্ধা হলেন তাঁর শাশুড়ী। তিনি একদিন কামোন্মাদ হয়ে নিজেকে নিবেদন করলেন কুনালের কাছে। কুনাল অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই স্ত্রীলোককে। প্রত্যাখ্যাতা নারী কাল ভুজঙ্গিনীর মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে এলেন তাঁর নিজের অন্তঃপুরে। তারপর সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কী করে নেওয়া যায় এর প্রতিশোধ।

একদিন মহারাজ অশোক যখন নিদ্রিত ছিলেন—সেই সময় সেই নারী তাঁর দাঁতের ছাপ তুলে নিয়ে একটী পত্র শীলমোহর করে পাঠালেন কুনালের কাছে। তাতে আদেশ রইল পত্র পাওয়া মাত্র এই পত্রবাহকের হাতে উপড়ে দেবে তোমার চোখ দুটী। নীচে স্বাক্ষরও রইল মহারাজ অশোকের।

পত্র পাঠ করেই কুনালের প্রিয় ভৃত্য ইতঃস্তত করতে লাগল। কিন্তু নির্ভীক কুনাল তখনই বললেন—পিতা যখন আদেশ করেছেন তখন অবশ্যই তা পালন করতে হবে। কাজেই আর দেরী কেন?

তখনই তিনি ঘাতককে ডেকে নিজের চক্ষু দুটী উপড়ে নিতে বললেন। আদেশ অনুসারে কাজ হল। শাসক কুনাল, রাজপুত্র কুনাল দু'চোখ হারিয়ে অন্ধ ভিক্ষুর বেশে পথে পথে করুণ গান গেয়ে বেড়াতে লাগলেন বীণা বাজিয়ে।

এমনি করে দুঃখের গাথা গাইতে গাইতে কুনাল একদিন এসে পড়লেন অশোকের রাজধানীতে। এক রজনী শেষে রাজপ্রাসাদের এক প্রান্তে বসে কুনাল অতি করুন স্থুরে বীণা বাজিয়ে তাঁর মর্মগাথা গাইছিলেন। আকাশ বাতাস ভরে গিয়ে ছিল তাঁর সে গানে। মহারাজ অশোকের কানে গিয়ে সে গানের স্থুর পৌঁছাল। শুধু কানে নয়—সে গান আঘাত করেছিল মহারাজ অশোকের মর্মস্থলে। তিনি বিচলিত হয়ে তখনই অন্ধ ভিক্ষুককে তাঁর সমুখে আনবার আদেশ দিলেন। ভিক্ষুক উপস্থিত হতেই অশোক দেখলেন অন্ধ ভিক্ষুকের বেশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয় পুত্র কুনাল। তাঁর সেই পদ্ম-পলাশের মতো উজ্বল দুটী চোখের স্থানে অন্ধকারভরা দুটী গর্ত। মহারাজ কুনালকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। তারপর খোঁজ নিলেন—কীসে কুনালের অমন দশা হল।

সমস্ত ব্যাপার শুনে তিনি যারপর নাই বিস্মিত হলেন। তারপর নিজে সমস্ত ঘটনার অনুসন্ধান করে সেই ক্রূর প্রকৃতির পিশাচী নারীকে তিনি অতি কঠোর শাস্তি বিধান করলেন।

পরে অবশ্য এক মহাপ্রাণ ভিক্ষুর অনুগ্রহে কুনাল তাঁর চোখ আবার ফিরিয়ে পেয়েছিলেন।

তক্ষশীলা পরিদর্শন করার সময়ে সাঙের কানে পৌঁছাল কাশ্মীর রাজ্যের খ্যাতি।

সাঙ আর কালবিলম্ব না করে তক্ষশীলা থেকে চলে এলেন কাশ্মীরে। কাশ্মীর দেখে সাঙ রীতিমতো মুগ্ধ হলেন। তাই তিনিও কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলে অভিহিত করতে এতটুকু কুণ্ঠা করেন নি। সাঙ তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন—কাশ্মীরের চার সীমান্তে মৌন প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। খুব ছোট আর সরু কয়েকটি গিরিপথ তাদের ভেদ করেছে। এই পথ দিয়ে বাইরে থেকে কাশ্মীর রাজ্যে ঢুকতে হয়। এর জন্যেই বাইরের রাজারা কেউ চট করে কাশ্মীর আক্রমণ করতে পারে না। কাশ্মীরের রাজধানীর পশ্চিম দিককে উর্বরতর করে বয়ে চলেছে বিতস্তা নদী—আদিম গ্রীকরা যাকে ডাকত হাইডাস্‌পিস্‌ বলে, আর ইউরোপীয়রা বর্তমানে যার নাম দিয়েছে ঝেলাম। নদীজলে বিধৌত উর্বরা ভূমিতে ফল ফুলের অফুরান প্রাচুর্য। এদের শোভায় কাশ্মীর সত্যই রমণীয়, সত্যই এ দেশ হল মাটীর স্বর্গ। এখানকার আব-হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে এখানে তুষারপাতও হয়। কিন্তু ঝড়ের বেগ এখানে অনেক কম।

কাশ্মীরের অধিবাসীদের আকৃতি অতি সুশ্রী। তাদের পরণে সাদা তুলার জামা কাপড় কিন্তু মাথায় পশমের টুপী।

হিমালয়ের উপত্যকাগুলি যেমন চির নীরবতার রাজত্ব, কাশ্মীরেও প্রায় সেই রকম। সহরের বাইরে পাহাড়ের কোলে কোলে জমে আছে অটল নিস্তব্ধভাব। আর এই জন্যই বোধ হয় সেই সব জায়গাগুলি মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে রহস্যঘন—যাদের ঘিরে রচিত হয়েছে বহু রূপকথা।

সাঙ কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুরে—বর্তমান শ্রীনগর সহরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বার্তা সহরের চারদিকে ছড়িয়ে

পড়ল। কাশ্মীরের রাজা সে সংবাদ পেয়ে নিজের সমস্ত সভাসদ সঙ্গে নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন। সারা শ্রীনগর সহর উজাড় করে সেই জ্ঞান তপস্বীর আগমনের পথে বিছিয়ে দেওয়া হলো ফুলের আস্তরণ। আর দেশ বিদেশ থেকে আনা বহু রকম সুগন্ধি দ্রব্যের স্রোত বইতে লাগল পথের দুপাশে। পথের ওপর ছেয়ে দেওয়া হল বহুমূল্য কারুকার্য খচিত চন্দ্রাতপে। তারপর মহারাজ সেই সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করলেন বিরাট এক হাতীর পিঠে আরোহণ করতে। এইভাবে এক পরম আড়ম্বরের মাঝে তাঁকে নিয়ে আসা হল রাজবাড়ীতে। সপারিষদ মহারাজ তাঁকে অনুগমন করলেন পদব্রজে। পরদিন সেই বিখ্যাত অতিথির জন্য আয়োজন করা হল এক প্রকাণ্ড ভোজসভার। সেই সভায় রাজা অনুরোধ জানালেন সাঙকে বৌদ্ধ-ধর্মের কতকগুলি কূট তত্ত্বের মীমাংসা করার জন্য। সাঙ সেই সভার বিদগ্ধ মণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করলেন যথোচিত আলোচনার দ্বারা। শেষে কাশ্মীরের রাজাকে বললেন—তিনি নিজেই এদেশে এসেছেন তাঁর গভীর জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। সে তৃষ্ণা তাঁর এত প্রবল যে সুদূর চীন দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসার যে প্রাণান্তকর কষ্ট তাও তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি সেই সঙ্কল্প থেকে। শুনে মহারাজ ভারী খুশী হলেন। তখনই তিনি সাঙকে তাঁর গ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত পাঁচটি পুঁথি দিলেন—তাদের থেকে যাবতীয় জাতকের গল্প, বহু সূত্র ও শাস্ত্রের নকল নেবার জন্যে।

কাশ্মীরে সাঙ দর্শন পেলেন এক সত্তর বছরের জ্ঞানী বৃদ্ধের। তিনি ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। বৃদ্ধের সকল শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেখে সাঙ অবাক হলেন। মুগ্ধ হলেন তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে আর প্রতিভা বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তিতে। বৃদ্ধের সাহচর্যে এসে সাঙ মনে করলেন যে তাঁর সমস্ত

পথের কষ্ট যেন এক মুহূর্তে সার্থক হয়ে গেল। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসী সাঙকে দেখে বড়ই প্রীত হলেন। সাঙ তাঁর সাথে হৃদয়ের সমস্ত কপাট খুলে দিয়ে আলাপ করলেন—প্রশ্ন করলেন—যাবতীয় কূটতত্ত্বের জটিলতার সম্বন্ধে। বৃদ্ধ হাসিমুখে সাঙকে তুষ্ট করতে লাগলেন উত্তর দিয়ে। সাঙ এই জ্ঞানভিক্ষুর কাছে বাস করলেন পুরো দুটী বছর—নানান শাস্ত্র আর দর্শনে পাঠ নিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম আর উৎসাহের সঙ্গে। এইভাবে গভীর অধ্যয়নের মধ্যে সাঙ কাশ্মীরে কাটিয়ে দিলেন ৬৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত। তারপর ফলভারশোভিত বৃক্ষের মতো পরিপূর্ণ মন নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নেমে এলেন। অন্তরে বাসনা রইল গাঙ্গেয় উপত্যকার পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে বুদ্ধের অপরাপর স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিকে আবিষ্কার করা।

দশ

কাশ্মীর ছেড়ে সর্বপ্রথম তিনি প্রবেশ করলেন পূর্ব পাঞ্জাবের 'শাকল' সহরে। এই সহর পরে নাম পেয়েছে শিয়ালকোট। একে প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকরা নাম দিয়েছিল সাংগল আর হিউয়েন সাঙ তাঁর চীনা ভাষায় একে বর্ণনা করেছেন সি-চে-লো নামে। শাকল হল বহু বিখ্যাত সহর। ঐতিহাসিকের কাছে এর প্রসিদ্ধি কিছু মাত্রও কম নয়। এখানে এক সময়ে রাজত্ব করেছেন সুদূর গ্রীসের তিনজন বিখ্যাত রাজা—ডিমেট্রিয়াস, এপোল্লোডোটাস্ আর মিরাণ্ডার। এঁদের মধ্যে মিরাণ্ডারই ছিলেন শৌর্য আর ধর্মানুশীলনের জন্যে বিশেষ বিখ্যাত। এই মিরাণ্ডারকে ভারতীয় ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছিল মহারাজ মিলিন্দ। মিলিন্দর বাহুবলে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল একদিকে বিহার ও অন্যদিকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত। এই দুৰ্দ্ধর্ষ বীরকে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে একদিন দীক্ষিত হতে হল। দীক্ষা দিলেন ধর্মাচার্য নাগসেন।

মহাপ্রাজ্ঞ দার্শনিক নাগসেন ও মহারাজ মিলিন্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, বিশেষ করে আত্মা ও নির্বাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেগুলি একত্র হয়ে স্থান পেয়েছে মিলিন্দ পঞ্‌হ (মিলিন্দ প্রশ্ন)এ। মিলিন্দপঞ্‌হ হল বৌদ্ধ দর্শনের এক অমূল্য গ্রন্থ। সাঙ শাকলে বসে মনে করতে লাগলেন সেই সব আলোচনার চিত্রগুলি। তীক্ষ্ণধী মিলিন্দের সেই জ্ঞান গভীর প্রশ্ন ও দ্রষ্টা নাগসেনের সেই সব উত্তরের প্রত্যেকটী সাঙের মনে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে।

একদিন পাঁচশত যবন ও আশীহাজার ভিক্ষুর সম্মুখে মহারাজ মিলিন্দ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনার পরিচয় কী? নাগসেন উত্তর দিলেন—মহারাজ, আমার নাম নাগসেন। কিন্তু এই 'নাগসেন' কথাটী শুধু মাত্র একটী সংজ্ঞা—একটী শব্দ মাত্র। এর মধ্যে সার পদার্থ কিছু নাই।

রাজা মিলিন্দ আবার বললেন—আমি এই পাঁচ শত যবন আর আশী হাজার ভিক্ষুর সম্মুখে এই প্রশ্ন করছি সুতরাং আপনি সঠিক উত্তর দিন।

অটল নাগসেন জবাব দিলেন—রাজন্, আমি যা বলছি তাই-ই সত্য।

রাজা তখন অধিকতর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন—হে ভিক্ষু, তাই যদি সত্য হয়, যদি আপনার মধ্যে অপর কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকে তাহলে আপনার এই সব অভাব পূরণ কে করছে? কেই বা আপনাকে পরিধেয়, আহার, আর পীড়ায় ঔষধ যোগাচ্ছে? এই যে দেহ ভোগসুখ—এর আসল অধিকারী কে? ধর্মপথে আসলে বিচরণ করছে কোন জন? কেই বা পরিশ্রমের দ্বারা সৎবৃত্তি লাভ করছে? হনন-কর্তন, বঞ্চনা-চুরী, সত্য-মিথ্যার ভাষণ, পান-ভ্রমণ-বিহার, এসব করে কে? সৎকর্মের ফল আসলে অর্শায় কার ওপরে? নির্বাণই বা কার অধিগত? তবে কি সংসারে সদসৎ কর্ম বলে কিছু নাই? সতের পুরস্কার অসতের দণ্ডবিধান তবে কী বৃথা? যদি কেউ এখনই আপনাকে হত্যা করে তবে কী সে ব্যক্তি হত্যাকারী নয়? তারপর নাগসেনের মাথার চুলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মহারাজ বললেন—ঐ চুলগুলি কী আপনার মাথার নয়?

নাগসেন পূর্বের মতোই অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দিলেন—না মহারাজ।

—তবে কী আপনার দন্ত, চর্ম, অস্থি এসবই নাগসেন?

—না মহারাজ।

—তবে কী এই অস্থি-মেদ-মজ্জায় গড়া ভৌতিক দেহ তার সমস্ত আনন্দ বেদনার অনুভূতি নিয়েই নাগসেন?

—মহারাজ, তা-ও না।

মিলিন্দ বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন—তাহলে কোথায়

নাগসেন ? যেদিকেই চোখ রাখি কই নাগসেন বলে কাউকেই তো দেখতে পাই না। ভিক্ষু আপনি মিথ্যাচরণ করলেন। নাগসেনের কোন অস্তিত্বই নাই।

তখন নাগসেন স্মিতমুখে রাজা মিলিন্দকে প্রশ্ন করলেন—রাজন, আপনি যাতে চড়ে এখানে এসেছেন ওটি কী ?

রাজা বললেন—শকট।

নাগসেন শুধালেন—শকট শব্দের এবার বিশ্লেষণ করুন। কোনটাকে আমি শকট নাম দেব ? ঐ মূল দণ্ডটীকে ? না সুসজ্জিত আচ্ছাদনকে ? ওর চাকাগুলি, নেমিগুলি, না ওর রশ্মিটাই শকট আখ্যা পায় ? অথবা শকট হল এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটা পদার্থ আর যদি এগুলিকে একে একে পরিত্যাগ করেন—তবে শকট বলতে কোনটি অবশিষ্ট থাকে মহারাজ ?

মহারাজ বলিলেন—কিছুই না।

নাগসেন বললেন—শকট বলে যে শব্দ উচ্চারণ করলেন কিছু পূর্বে তাহলে তার কোন অস্তিত্বই এখন আর নাই ? ভারতেশ্বর, আপনিই বা কার ভয়ে এই মিথ্যা উক্তি করলেন ?

রাজা মিলিন্দ বললেন—পূজ্য নাগসেন, আমি অসত্য বলি নাই। অক্ষদণ্ড, চক্র, উপাদানভূত কাষ্ঠ প্রভৃতিরই সংজ্ঞা প্রকাশ করতে শকট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তম কথা, মহারাজ। বুঝলাম, আপনি শকট কী তা চিনেছেন। হে রাজন, আমিও এই হিসাবে আমার চুল-চর্ম-অস্থি-মজ্জায় গড়া ভৌতিক দেহকে, বেদনা-অনুভূতি, আকৃতি-জ্ঞান সমবায়ের সংজ্ঞাকে বোঝাতে নাগসেন শব্দটি ব্যবহার করেছি। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে ঐ শব্দবোধক পদার্থ কিছুই পাওয়া যায় না।

একবার নির্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন মহারাজ মিলিন্দ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নাগসেনকে।

—এ পৃথিবীতে পদার্থ তিন প্রকার। কর্মজ, হেতুজ, ঋতুজ। এ ছাড়াও কি অন্য কিছু থাকতে পারে?

নাগসেন উত্তর দিলেন—নির্বান, কর্মজ, হেতুজ বা ঋতুজ নয়।

মিলিন্দ প্রশ্ন করলেন—কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তো সেকথা বলেন নি। তিনি নির্বাণ লাভ করবার জন্য মানুষকে অর্হৎ হবার উপদেশ দিয়েছেন। অর্হত্বের নানান উপায় দেখিয়েছেন। সেগুলি কী কর্মজ, হেতুজ বা ঋতুজ নয়?

নাগসেন বললেন—প্রভু যে একথা বলেছেন—তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তিনি তো এমন কথা কোথাও বলেন নি যে নির্বাণোৎপত্তির কোন হেতু আছে।

বিস্মিত মিলিন্দ বললেন—এ কেমন করে সম্ভব। আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অর্হত্বই হল নির্বাণ প্রাপ্তির হেতু। তবে আবার কেন বলছেন যে নির্বাণের কোন হেতু নাই। এ যে আমি বিষম সমস্যায় পড়লাম। শিশুর পিতা আছে—তার পিতারও পিতা আছে। শিক্ষকেরও তো শিক্ষক থাকে—এই সত্য তো আমরা সবাই জানি।

নাগসেন বললেন—নির্বাণ উৎপত্তি ধর্মের বশীভূত নয়। তাই তার উৎপত্তি নাই। সুতরাং ভগবান বুদ্ধদেব তার কোন উৎপত্তি কারণ দেখান নাই।

তখন মহারাজ মিলিন্দ বললেন—সে কথা সত্য। তবে নির্বাণের স্বরূপ কী তা আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন।

নাগসেন বললেন—আচ্ছা বলুন দেখি মহারাজ, কোন ব্যক্তি কী নিজ শক্তিতে এই শাকল সহর থেকে হিমালয়ে যেতে পারে?

রাজা বললেন—নিশ্চয়ই পারে।

নাগসেন বললেন—নির্বাণ লাভও সেই রকম। নির্দিষ্ট মার্গে গমন করলে মানবের নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণের পথ মানুষকে

দেখান যায় কিন্তু কিসে যে নির্বাণ সংঘটিত হয় তা বোধাতীত—পরম প্রহেলিকায় সমাচ্ছন্ন।

মহারাজ মিলিন্দ প্রশ্ন করলেন—আপনি কী মনে করেন যে গুণ বা নির্গুণ, যোগ্যতা বা অযোগ্যতা—যার থেকে নির্বাণের উৎপত্তি তা ধারণাতীত ?

নাগসেন জবাব দিলেন—মহারাজ, নির্বাণ গুণাগুণ, সদসৎ কিছু থেকেই উৎপন্ন নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে নির্বাণে অসৎ-এর স্পর্শ মাত্র নাই। নির্বাণ হল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। অথচ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে তাকে ধরাও যায় না।

রাজা মিলিন্দ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন—তাহলে নির্বাণের কোন অস্তিত্বই নাই।

নাগসেন সুদৃঢ় কণ্ঠে সুপ্রচুর প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন—মহারাজ, নির্বাণ অবশ্যই আছে। নির্বাণ অন্তরের অনুভূতি। নির্বাণ হল নির্মল পরিশুদ্ধ আত্মার আনন্দময় অভিব্যক্তি। যে সব রাহুত (অর্হৎ) মার্গসুখ ভোগ করেছেন—তাঁরাই এই অপার আনন্দ অনুভব করতে সমর্থ।

রাজা বললেন—নির্বাণের কিছু কী প্রত্যক্ষীভূত হয় ?

নাগসেন বললেন—না। এ ঠিক বায়ুর মতো। তাকে অনুভব করি কিন্তু চোখে দেখি না। কোন গুণ ধর্মের আরোপ করে নির্বাণকে দেখান সম্ভব নয়।

মিলিন্দ বললেন—তবে ওতে আমার বিশ্বাস হয় না।

নাগসেন বললেন—রাজা আপনাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে মহাসমুদ্রের তল কোথায় ? তার মধ্যে কত রকমের প্রাণী আছে। অথবা তার গভীরতার স্বরূপ কী ? আপনি কী একথার সম্যক জবাব দিতে পারেন ?

রাজা বললেন—না।

নাগসেন বললেন—নির্বাণও এই মহাসমুদ্রের মতো—অনাদি, অসীম, অনন্ত। তারপর একটু থেমে বললেন—নির্মল শ্বেত কমলকে নির্লিপ্ত হয়ে জলের ওপর ফুটে থাকতে দেখেছেন তো? নির্বাণের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। সেই রকম ক্লেশশূন্য, প্রফুল্ল ও নির্লিপ্ত। শীতল জল যেমন তৃষ্ণার্তের সকল তৃষ্ণা দূর করে—নির্বাণ তেমনি মানুষের সকল বাসনা-কামনার বিলুপ্তি ঘটায়। নির্বাণ-প্রজ্বলন্ত অনলে করুণাবারি। মহৌষধির মতো ব্যাধির সকল যন্ত্রণার নিরাময়-কারক। তথাপি নির্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র আনন্দ। কারণ এর কোন হেতু নাই উদ্দেশ্যও নাই।

মহারাজ মিলিন্দ উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন—আরও একটু বিষদভাবে একে ব্যাখ্যা করুণ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ।

নাগসেন বলতে লাগলেন—নির্বাণের অবস্থা হল পরম ও চরম আনন্দবোধের অবস্থা। সে অবস্থায় ভয় নাই। অকম্পিত দীপ-শিখার মতো সেখানে পবিত্র, নির্মল শিখায় চিত্ত কল্যাণালোকে প্রজ্বলিত থাকে। সে এক পরম পরিতৃপ্তি, শুদ্ধশান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি।

মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—নির্বাণ কোথায় অবস্থিত? যে-জন নির্বাণ প্রাপ্ত হন তাঁর কী কোন স্বতন্ত্র স্থান আছে?

নাগসেন উত্তর দিলেন—এই অনন্ত বিশ্বে নির্বাণ বলে কোন স্থান নাই—অথচ নির্বাণ সর্বব্যাপী। যাঁরা নির্বাণ লাভ করেন তাঁরা সর্বত্রই থাকতে পারেন।

মিলিন্দ প্রশ্ন করলেন—তবে ভগবান বুদ্ধ কী এখনও বিদ্যমান? আপনি কী তাঁকে দেখাতে পারেন?

নাগসেন উত্তর দিলেন—প্রভু নির্বাণ লাভ করেছেন। তাঁর আর পুনর্জন্ম নাই। সুতরাং তিনি যে কোথায় তা বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানি যে তিনি আছেন। নির্বাণলব্ধ বোধির সত্তা হল

জ্যোতির্ময় আলোক শিখরের মতো। সে আলোক এখানে নিভে গেছে বলেই কী বলব—পৃথিবীতে কোথাও আলোক নাই ?

অর্হত সম্বন্ধে ধর্মাচার্য নাগসেন মহারাজ মিলিন্দকে যে কথা বলেছিলেন তাও সাঙের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল।

নাগসেন বলেছিলেন—অর্হত্ব হল নানাবিধ উপায়ে চিত্তকে পরিশুদ্ধ ও নির্মল করা। মন যতক্ষণ সুশিক্ষায় নিয়মবদ্ধ না হয়—ততক্ষণ চাঞ্চল্যবশে সে সংযম-রজ্জু ছিঁড়ে অনভিপ্রেত নানান কর্ম করে ও তার ফলে বার বার মহৎ দুঃখে পতিত হয়। তখন মন থেকে ক্রন্দন, বিভীষিকা ও আর্তনাদ উঠতে থাকে। কিন্তু অর্হতদের চিত্ত হল উপযুক্ত সংযমের শিক্ষাধীন। সমাধি ও যোগদ্বারা সে চিত্ত স্তম্ভের মতো সুদৃঢ় ও নিবাত শিখার মতো অকম্প। অর্হতের চিত্ত সর্বদা নির্বাণের আনন্দে ভরপুর। সুতরাং দেহের ক্লেশ থাকলেও চিত্ত সর্বদা ক্লেশবিমুক্ত।

মিলিন্দ প্রশ্ন করলেন—দেহ ক্লেশমুক্ত থাকলেও মন ক্লেশক্লিষ্ট হবে না—এ কেমন করে সম্ভব হয় ?

নাগসেন বললেন—ঝড়ে মহীরুহের শাখা পল্লব বিষম দুলতে থাকে। কিন্তু তার মূল ও কাণ্ড অবিচলিত থাকে। সেই রকম অর্হৎগণের চিত্ত চতুর্মার্গরূপ রজ্জুতে সমাধিরূপ স্তম্ভে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে। সুতরাং দেহ ক্লিষ্ট হলেও তাদের চিত্ত সর্বদাই অবিচলিত।

•

সাঙ শাকলে আসবার দুই শতাব্দী আগে বৌদ্ধধর্মের একজন অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক এখানে বাস করে গেছেন—তাঁর নাম ছিল বসুবন্ধু। বসুবন্ধুর মৃত্যুর পর হতেই শাকলের যে দশা হল সে দশা পুরুষপুর গান্ধারেরই মতো। গান্ধার সভ্যতার উচ্ছেদের মূলে কুখ্যাত হয়ে আছে হুন মিহিরকুলের যে কলঙ্কময় হাত—শাকল ধ্বংসের মূলেও কাজ করেছে তার সেই হাতেরই প্রচণ্ড আঘাত।

ভারতবর্ষের এ্যাটিলা, মানব সভ্যতা-কৃষ্টি বিধ্বংসী বর্বর মিহিরকুল এই শাকলকেই করেছিল তার রাজধানী। এই জায়গাকেই কেন্দ্র করে সে প্রচণ্ড দর্পে চালিয়েছিল বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে হটতে বাধ্য হল মালবের অধিপতি যশোধর্ম দেবের কঠিনতর তরবারির আঘাত বুকে নিয়ে। সে হল ৫৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। মিহিরকুল পালিয়ে এল কাশ্মীরে। তারপর পরাজয়ের গ্লানি মুছল কাশ্মীররাজের রাজ-শোণিতে। কাশ্মীরে বসে মিহিরকুল আহত সাপের মতো মারাত্মক ছোবল মারতে লাগল সিন্ধু নদের তু দিকের বৌদ্ধবিহারগুলির ওপর। কিছুদিন পরেই এই অত্যাচার শেষ হল—মিহিরকুলের রক্তপিপাসু আয়ু ফুরোল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের অধিবাসীরা হুনদের কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করল। হুনরা গিয়ে আশ্রয় নিল উত্তর পাঞ্জাবে।

এরই কিছুদিন পরে উত্তর পাঞ্জাবে থানেশ্বর রাজত্বের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হুনরা আবার সেখান থেকেও সদলে তাড়া খেয়ে পালাল। এই ব্যাপার ঘটে যাবার বেশ কিছুকাল পরে হিউয়েনসাঙ এলেন থানেশ্বরে। থানেশ্বরে তখন রাজত্ব করছিলেন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন।

শাকল ত্যাগ করে চলে আসছিলেন সাঙ থানেশ্বরের পথে তাঁর সঙ্গী-সাথী নিয়ে। হঠাৎ পড়ে গেলেন একদল ডাকাতের হাতে। দলে ছিল পঞ্চাশ জন ডাকাত। তারা যাত্রীদের সব পোষাক-পরিচ্ছদ-গুলো পর্যন্ত খুলে নিল। সাঙ আর তাঁর জনকয়েক সঙ্গী সুযোগ বুঝে পালালেন। কাছেই ছিল এক মজা পুকুর—তার বুকে জন্মেছে প্রচুর ঘাস আর কাঁটা গাছের জংগল। তার দক্ষিণ পাড়টায় জল ঝরে পড়ার জন্যে সেখানে তৈরী হয়েছিল একটা প্রকাণ্ড গর্ত। সাঙ সেই গর্তের মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচালেন। ডাকাতরা খোঁজাখুঁজির পর

কারুর সন্ধান না পেয়ে স্থানত্যাগ করল। সাঙ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গুপ্ত স্থান থেকে বার হয়ে এলেন। কাছেই ছিল একটা গ্রাম, তাঁরা পৌঁছলেন সেই গ্রামে। সেখানে হাল দিয়ে মাটি চাষ করছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। সাঙ গিয়ে তাঁদের বিপদের কথা ব্রাহ্মণকে জানাতেই তিনি তখনই শিঙা বাজিয়ে ডাক দিলেন গ্রামবাসীদের। তারা সবাই মিলে বের হয়ে পড়ল ডাকাতদের খোঁজে। কিন্তু ততক্ষণে ডাকাতের দল গিয়ে ঢুকেছে গভীর জংগলে—তাদের নাগাল পাওয়া আর সম্ভব হল না।

অতঃপর সাঙ সেই গ্রাম পিছনে ফেলে এসে হাজির হলেন কাছে এক সহরে। সেখানে একজন সহৃদয় ব্রাহ্মণ—সাঙ আর তাঁর সঙ্গীরা যেসব জিনিষ হারিয়েছেন—সেগুলি উপহার দিয়ে তাঁদের অভাব দূর করলেন। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন একজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানী। পরিচয় পেয়ে সাঙ তাঁর কাছে বাস করলেন একমাস। আর শিক্ষা নিলেন মাধ্যমিকবাদের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের। ঐ ব্রাহ্মণের কাছেই সাঙ জানলেন—নাগার্জুনকে, জানলেন আর্যদেবকে। যোগাচার আর বিজ্ঞানবাদ এতদিন তাঁর কাছে যে রহস্যের জালে ঢাকা ছিল—সে রহস্যের অবগুণ্ঠন কিছুটা মোচন হল।

আবার পথে নামলেন সাঙ। এবার চলতে লাগলেন যমুনা নদীর অববাহিকা ধরে। ক্রমে তিনি এসে পড়লেন মথুরা সহরে। মথুরা যেমন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ তেমনি বৌদ্ধদেরও। মথুরা একাধারে হিন্দুদের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি আর বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্যায়ণের পুতাস্থি ধারক। বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্ত একবার চরম শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বুদ্ধের অনুগামী ভিক্ষুদলের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করে। এদিকে বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের কঠোরতা পালন করতে না পেরে প্রায় পাঁচ শ ভিক্ষু দেবদত্তের

দলে যোগদান করে। সেই সময়ে এই সারিপুত্ত ও মোগ্গল্যায়ন-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেই সেই ভিক্ষুরা নিজেদের মত পরিবর্তন করেছিল। মথুরা দেখে সাঙের ভাল লাগল। তিনি লিখলেন—এস্থান অতি শুষ্ক ও উত্তপ্ত সন্দেহ নাই তবুও এখানকার জমি উর্বরা। এখানকার অধিবাসীরা তাদের যতখুশী আমের গাছ পুঁতে বাগান করে। সে তো বাগান নয়—এক একটা জংগল।

মথুরা ছেড়ে সাঙ এগিয়ে এলেন যমুনার গতিপথ ধরে। পথে পড়ল মহাভারতের কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। সাঙ কুরুক্ষেত্র দর্শন করে স্মরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাণী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল সে বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়ে উঠেছে মহাপুরুষ শাক্যসিংহের পুণ্য আবির্ভাবে। বুদ্ধের জীবনী আর বাণীও তো মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে জগতের সকল রকম সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-করুণার অতীত হয়ে মোহমুক্তির দ্বারা নির্বাণের পথে এগিয়ে যেতে।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের চার পাশের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে যে রাজ্য একদা গড়ে উঠেছিল বর্দ্ধন সম্রাটদের বাহুবলে—তারই নাম স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর রাজ্য। সে হল সাত শতাব্দীর গোড়াকার কথা। এ রাজ্যের পূবে গঙ্গা, পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে রাজপুতানা। বর্দ্ধন বংশের সম্রাট প্রভাকর বর্দ্ধন মারা যাবার পর রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন। কিন্তু খুব বেশী দিন তাঁকে রাজত্ব করতে হলনা। গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তের মিলিত শক্তি কনৌজের রাজা গ্রহবর্মাকে যুদ্ধে নিহত করে। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত গ্রহবর্মার স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন শত্রুদের হাতে। এই রাজ্যশ্রী ছিলেন রাজ্যবর্দ্ধনের আদরের বোন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্যবর্দ্ধনও নিহত হলেন। এই ঘটনা ঘটে গেল রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে বসবার দু'বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৬০৪ খৃষ্টাব্দে। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে

সিংহাসনে বসলেন রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন। ইনি কিছুদিন পরে 'শিলাদিত্য' এই নাম নিয়ে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হন। এঁরই রাজত্বকালে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ এলেন কনৌজে। কনৌজ তখন ছিল মহারাজ হর্ষের রাজধানী। সাঙ হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে লিখেছেন—প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য হর্ষবর্দ্ধন সসৈন্যে পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে সুদূর পূর্বে গৌড় কামরূপ পর্যন্ত অশান্ত ভাবে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। তার সৈন্যদলের বুক থেকে লোহার বর্ম ও হস্তীযূথের পিঠ থেকে হাওদা সুদীর্ঘ ছয় বছরের মধ্যে একদিনও খোলা হয়নি। হর্ষ ছিলেন বিজয়ী বীর। একমাত্র মহারাষ্ট্রের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ছাড়া ভারতবর্ষের প্রতিটি নরপতি হর্ষবর্দ্ধনকে রাজচক্রবর্তী বলে মেনে নিয়েছিলেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন অতীতের মহামতি অশোকের মতো সত্যিকারের একজন শান্তিকামী ও সদাশয় সম্রাট। সম্রাট নিজে ছিলেন শৈব কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই প্রজারা তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল রাজর্ষি। তাঁর রাজদণ্ড ছিল মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের জ্বলন্ত প্রতিরূপ। সৎকার্যের প্রেরণায় হর্ষবর্দ্ধন নিমেষে স্নান আহারের কথা ভুলে যেতেন। তাঁর আদেশে বহু স্তুপ আর বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। তিনি জনসাধারণকে সাহায্য করবার জন্য রাজপথের ধারে বহু সাহায্যকেন্দ্র গঠন করেন—যাদের কাজই ছিল দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থীদের, পথিক ও আগন্তুকদের খাদ্য, রোগীর ঔষধ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা। প্রতিদিন হর্ষবর্দ্ধন হাজার বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন। আর হর্ষের উৎসাহ ও প্রযোজনায় পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে যে 'মোক্ষ মেলা' বসত তার নাম জানে না এমন ভারতবাসীই বিরল। এই মেলা বসত গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে। লক্ষ লক্ষ প্রার্থীর আগমন হত এখানে। সম্রাট হর্ষ দান করতেন তাঁর রাজভাণ্ডারের দরজা খুলে। দান করতে করতে

যথাসর্বস্ব দান করে এমন কী রাজকীয় পরিধেয়টা পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে তিনি নিঃস্ব চীরধারী হয়ে ফিরতেন।

কনৌজে সাঙ যখন প্রথম আসেন তখন হর্ষ রাজধানীতে ছিলেন না। কিন্তু কনৌজ সাঙকে মুগ্ধ করল। সেখানকার ভদ্রাবিহারের সংঘারামে বসে সাঙ ত্রিপিটকের সমস্ত টীকা অধ্যয়ন করলেন তিন মাস ধরে। তিনি লিখেছেন—কনৌজের সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। এই সহরের চারদিক বেষ্টন করে আছে বিরাট উঁচু পাঁচীল। আর তার পরই আছে সুগভীর খাল। সহরের মধ্যে রয়েছে বহু রমণীয় প্রাসাদ আর গম্বুজ। মাঝে মাঝে আছে পুষ্পোদ্যান। আর আছে বড় বড় পুষ্করিণী—যাদের জল কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ ও নির্মল। এর অধিবাসীরা অতি সুখে ও পরম ঐশ্বর্যের মধ্যেই বাস করে।

এগার

কনৌজ ছেড়ে সাঙ কিছু দিনের জন্য এলেন অযোধ্যায়। এই অযোধ্যাতেই বুদ্ধের দু জন প্রসিদ্ধ শিষ্য ও দার্শনিক—বৌদ্ধধর্মের বহু পুস্তকাদি রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন—এঁরা হলেন দুই ভাই আসঙ্গ ও বসুবন্ধু। মহাযান সম্প্রদায়ের দুই স্তম্ভের মতো যে দুই দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত—সেই যোগাচার আর বিজ্ঞানবাদের স্রষ্টা হলেন এই দুই মহাজ্ঞানী। সাঙ সশ্রদ্ধ চিত্তে এই দুই মনীষি যে বিহারে বাস করতেন তার ধূলা মাথায় তুলে নিলেন।

অযোধ্যায় বাস শেষ করে একদিন সাঙ একটা বড় নৌকায় তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যাত্রা করলেন প্রয়াগের উদ্দেশে। প্রয়াগের কাছে এসে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। সহর থেকে মাইল দশেক দূরে এক জায়গায় গঙ্গার তীর জুড়ে আছে কেবল অশোকের ঘন বন। তাদের ডালগুলি আবার ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে নদীর বুকে। সেই জংগলের ভিতর লুকানো ছিল কতকগুলি জলদস্যুর নৌকা। যাত্রীদের সাড়া পেয়েই তারা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিউয়েন-সাঙের নৌকার ওপর। বাধা দিতে গিয়ে সাঙের জনকয়েক সঙ্গীর প্রাণ গেল। বাকী সঙ্গীরা ভয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। দস্যুরা যাত্রী-দের সব পোষাক-পরিচ্ছদ টাকাকড়ি লুটে নিল আর সাঙকে বেঁধে নিয়ে গেল গঙ্গার তীরে। এই সব দস্যুরা ছিল শাক্ত—দেবী দুর্গার উপাসক। এদের নিয়ম ছিল শারদীয়া পূজার সময়ে দেবীর সম্মুখে একটী দিব্য লক্ষণযুক্ত নরকে বলি দেওয়া। তারা সাঙের সুদর্শন চেহারা দেখে ঠিক করল যে সাঙকেই এবার দেবীর কাছে বলি দেওয়া হবে। একথা তারা সাঙকে জানিয়েও দিল। উত্তরে সাঙ বললেন—এই নশ্বর রক্ত-মাংসের শরীরটাকে উৎসর্গ করলে যদি তোমাদের মঙ্গল হয়—তবে আমি এখুনি তোমাদের দেবীর কাছে বলি হতে রাজী

আছি। কিন্তু হে মহানুভব ব্যক্তিরা! তোমরা কী জান কেন এই শরীর সুদূর চীন দেশ থেকে অশেষ কষ্ট সহ্য করে, বহু মরণকে তুচ্ছ করে এই পুণ্যভূমি ভারতে এসেছে? আমার এখানে আসার মূলে রয়েছে বোধিসত্বের এক মহান উদ্দেশ্য। আমি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের কিছুটা নিয়ে যেতে চাই চীনের জনসাধারণের উপকারের নিমিত্ত। আমি আমার নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে এখানে আসিনি। এসেছি সেই পরম করুণাময় বুদ্ধের জন্মভূমিকে সমগ্র চীনের হয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে আর তাঁর বাণীকে সফল করে তুলতে। কাজেই আমার মনে হয় আমার প্রাণনাশ করলে হয়তো তোমাদের মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই বা কিছু ঘটে।—ইতিমধ্যে সাঙের কয়েকজন সঙ্গী সেই জায়গায় এসে পৌঁচেছে। তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—দোহাই তোমাদের, আমাদের ভিতর যাকে ইচ্ছা হয় তোমরা বধ কর কিন্তু এই মহামনীষির, ঋষিকল্প পুরুষের প্রাণ তোমরা নিও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তাদের সব অনুরোধই ব্যর্থ হল। দস্যুরা রইল তাদের সঙ্কল্পে অটল।

দস্যু-দলপতির আদেশে সাঙকে অশোককুঞ্জের জলে স্নান করানি হল। কাছেই গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে তৈরী হল বেদী! দুজন দস্যুকে আদেশ করা হল তরবারি কোষমুক্ত করতে। সাঙকে বেদীর কাছে নিয়ে আসা হল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই প্রশান্ত মুখে তখনও না ছিল কোন উদ্বেগের চিহ্ন, না ছিল কোন ভয়ের কুঞ্চন। দস্যুরা একটু বিস্মিত হল বৈকি! সাঙ দস্যু-দলপতিকে বললেন—আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। আমার নশ্বর শরীরটাকে একটুখানির জন্য রেহাই দাও—যাতে করে শান্ত চিত্তে আনন্দিত মনে আমি নির্বাণ লাভ করতে পারি। বলতে বলতে তিনি যোগাসনে বসে দু'চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যাননেত্রে দেখতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র সেই প্রশান্ত করুণাঘন মূর্তি আর নির্বাণের রাজ্যকে।

প্রার্থনা করলেন—হে জ্যোতির্ময়, হে সর্বপাপহর, হে সর্বসন্তাপ-নাশন! আমাকে তোমার চিরনির্বাণের বাণী শোনাবার জন্যে, তোমাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবার জন্যে, আর সর্বশেষে অন্তিমে বোধি লাভ করবার জন্যে—এই মাটির কোলে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করতে দাও। হে দেবতা, হে মহান্ আত্মা, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর পুনরায় যেন সর্বজগতের কল্যাণের জন্যে আমার আবার জন্ম হয়। এই সব নিষ্ঠুর মনে করুণার ধারা বহাবার জন্যে আর জগতের ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ করে সর্বজীবে সমান সুখ শান্তি আনবার জন্যে আমাকে আবার এ জগতে পাঠিও, হে প্রভু! হে অনন্ত জ্ঞানের আকর, তুমি ধন্য, হে পবিত্র বোধির সত্বা, তুমিই ধন্য।

ক্রমশঃ সাঙের মন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে লাগল। তিনি একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগলেন মনের গভীরে—ভাবের অফুরাণ আলোর লোকে। তাঁর বোধ হতে লাগল তিনি যেন হেঁটে চলেছেন সুমেরুর তুষারশুভ্র চূড়ার ওপর দিয়ে। ক্রমে একটি একটি করে তিনটী স্বর্গ তিনি পার হলেন—এসে পৌঁছালেন সেই পরম শান্তিময়ের প্রাসাদে। সেখানে দেখলেন এক দিব্য জ্যোতির্মণ্ডিত সিংহাসনে প্রসন্ন, প্রশান্ত মুখে বসে আছেন মৈত্রেয়—দুটী চোখে তাঁর ঝরে পড়ছে শান্তি ও করুণার পবিত্র ধারা। তাঁর চারপাশে আলো করে বসে আছেন স্বর্গের দেবতাবৃন্দ। দেখে সাঙের মন আনন্দসাগরে ঢেউয়ের মতো নাচতে লাগল। তিনি ভুলে গেলেন বাহ্য জগতের সব কিছু, ভুলে গেলেন যে তাঁর রক্তের তৃষ্ণায় হিংস্র নেকড়ের মতো তাঁর দেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাকাতের দল। তাঁর সঙ্গীদের আকুল ক্রন্দনও তাঁর কানে এসে পৌঁছালনা। এমন সময়ে ঘটলো এক ব্যাপার—তা যেমন অলৌকিক তেমনি বিস্ময়ের।

আকাশের কপাল কুঁচকে উঠলো ভ্রূকুটীর কুটীল রেখায়।

দিগ্বিদিক উঠল শিউরে। চারিদিক আঁধারে ঢেকে উঠল দমকা ঝড়। গাছগুলো আছাড় খেতে খেতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো ভীষণ শব্দ করে। ধুলোয় অন্ধকার হল প্রগাঢ়তর। গঙ্গার বুক উঠলো ফুঁসে আর কুণ্ডলী পাকান সাপের মত ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠতে লাগলো কুঁচকে। দস্যুদের নৌকাগুলো গেল জলের তলায় তলিয়ে। দস্যুদলপতির লাগলো বিষম ভয়। সে যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করল—ইনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

একজন জবাব দিল—ইনি চীনের বিখ্যাত জ্ঞান-তপস্বী সন্ন্যাসী হিউয়েন সাঙ। ইনি এসেছেন বুদ্ধের অমৃতময় মন্ত্রকে সফল করে তুলতে। তোমরা যদি এই মহান্ আত্মার প্রাণ বধ কর তাহলে তোমাদের পাপের অবধি থাকবে না।

ভীত দস্যুদল তখন সাঙের চরণে পড়ে প্রার্থনা করতে সুরু করল। কিন্তু কোথায় সাঙ? তাঁর চেতনা তখন বিচরণ করছে এক পরম আনন্দলোকে। অবশেষে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে ডাক দিতে তাঁর ধ্যান ভাঙলো। তিনি চোখ খুলেই বললেন—সময় হয়েছে? তারপর যখন সমস্ত ঘটনা শুনলেন তখন তিনি দস্যুদের উপদেশ দিলেন হিংসার পথ পরিত্যাগ করার। তারা সবাই তাদের হাতের অস্ত্র বিসর্জন দিল গঙ্গায়—আর কী আশ্চর্য! সেই মুহূর্তে হল সব-রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান। দস্যুরা দীক্ষা নিল সাঙের কাছে।

সাঙ এলেন প্রয়াগে।

প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সেদিনও ছিল এক জনবহুল স্থান। পবিত্র গঙ্গাকে হিন্দুরা দেবী আখ্যা দিয়েছেন। তার তীরে বহু ব্রাহ্মণকণ্ঠে সাঙ গঙ্গা আরাধনা শুনলেন—গঙ্গা ফেনসিতা জটা পশুপতেঃ। এলাহাবাদ ছিল গুপ্ত সম্রাটদের রাজধানী। এখানে যদিও মহামতি অশোক একটী স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন আর মহাযান দার্শনিক

আর্যদেব ধর্ম-প্রচার করছিলেন এই প্রয়াগে তবুও এখানে বৌদ্ধধর্মের উপাসক ছিল অতি অল্প। এ হল হিন্দুদের এক বিরাট তীর্থ। এখানে আছে মাত্র দুটী বৌদ্ধবিহার—কিন্তু হিন্দু দেব-দেবীদের মন্দির অসংখ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু রাজারা মনে করতেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দানব্রত করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। সেই বিশ্বাস থেকেই প্রয়াগে এই দানক্ষেত্রের উদ্ভব।—লিখলেন সাঙ।

প্রয়াগ ছেড়ে কতকগুলি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনার তীরে কৌশাম্বী নগরীতে এসে হাজির হলেন হিউয়েন সাঙ। প্রাচীন কৌশাম্বী বা এখনকার কোশাম ছিল বহুকাল পূর্বে গুপ্ত রাজ্যের আর একটী রাজধানী। এখানেও অশোক নির্মাণ করিয়েছিলেন এক বৌদ্ধ স্তূপ।

. কৌশাম্বী দেখা শেষ করে হিউয়েন সাঙ তাঁর যাত্রাপথ ঠিক করলেন উত্তরমুখী। অনেক সময় কেটে গেল—এখনও তাঁর দেখা হয়নি শাক্য মুনির জন্মস্থান। যে স্থান হল সমগ্র ভারতের তথা পৃথিবীর সেই পরম আদর্শের খনি—তার ধূলি মাথায় নেবার জন্যে সাঙের মনে কতদিন ধরে জমে আছে আকুল আগ্রহ। তাই তিনি আর কালবিলম্ব করলেন না। চললেন কপিলাবাস্তুর দিকে।

প্রথমেই পথে পড়ল শ্রাবস্তী।

শ্রাবস্তীতে এসে সাঙের মনে পড়ল ভগবান বুদ্ধের সময়কার শ্রাবস্তীকে। বহু জনাকীর্ণ, মহাকোশলের রাজধানী। বুদ্ধভক্ত রাজেন্দ্র প্রসেনজিতের আবাস এই শ্রাবস্তী।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয়বর্ষের শেষের দিকে ভগবান শাক্যসিংহ এসেছিলেন শ্রাবস্তীতে। এখানে মহাকোশলের অধিপতি প্রসেনজিত বা পশিনদ প্রভুকে প্রভূত অভ্যর্থনায় রাজকীয় সমারোহে গ্রহণ করেন। তারপর নগরীর প্রান্তে পরম রমণীয় জেতবন উদ্যান বুদ্ধ ও তাঁর অনুগত ভিক্ষুদের বাসের জন্য দান করেন। এই জেতবন উদ্যানেই

বুদ্ধের পরম ভক্ত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বহু অর্থব্যয়ে তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন সুন্দর উপাসনা মন্দির, বিরাট বিরাট দীর্ঘিকা আর অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত কানন।

সেই জেতবন উদ্যান আবার এতদিন পরে সাঙের চোখে বর্ষণ করল অপার সৌন্দর্য।

এখানে এসে সাঙের আরও একটী ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর একদিন শ্রাবস্তী থেকে শাকেত নগরীতে যাবার সময় পশিনদ বা প্রসেনজিত-এর সঙ্গে ভিক্ষুনী ক্ষেমার সাক্ষাৎ হয়। এই ক্ষেমা ছিলেন এক বিশেষ বিদগ্ধা, জ্ঞান-গৌরবশালিনী নারী।

রাজা ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। তবুও আত্মার গতি সম্বন্ধে রাজার মনে ছিল কতকগুলি প্রশ্ন—যার নিরশন বহুদিন পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি। তাই রাজা ক্ষেমাকে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন—

হে পূজার্হা! সেই বুদ্ধ হলেন পূর্ণস্বরূপ একথা সত্য। কিন্তু তিনি কী মৃত্যুর পরও বিদ্যমান থাকেন?

ক্ষেমা উত্তর দিলেন—রাজন, বুদ্ধ যে পূর্ণস্বরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে মৃত্যুর পরও বিদ্যমান একথা তো তিনি কখনও বলে যাননি।

পশিনদ আবার প্রশ্ন করলেন—তবে কী সেই পূর্ণস্বরূপ মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না?

ক্ষেমা জবাব দিলেন—মহারাজ, সে কথাও তো তিনি কিছুই বলে যাননি।

রাজা বললেন—তবে কী তিনি মৃত্যুর পর বিদ্যমান আছেন এবং নাই-ও? মহোদয়ে, সেই মহাপুরুষ কেন এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেননি?

তখন ক্ষেমা পশিনদকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ আপনাকে একটী প্রশ্ন করবার অনুমতি চাই। আচ্ছা বলুন দেখি আপনার রাজকর্মচারীদের মধ্যে এমন গণনানিপুণ কী কেউ আছেন যিনি নদীতীরের সব বালুর কণাগুলি গণনা করতে পারেন?

—না, তা কেউই পারে না।

—আপনার কোনও হিসাব-রক্ষক কী বিশাল সমুদ্রের জলরাশির পরিমাপ করতে পারে?

—না মহোদয়ে, তা পারে না।

—কেন পারে না মহারাজ?

—কারণ সমুদ্রের জল অপরিমেয়, অতলস্পর্শী।

—হে রাজন্, পূর্ণস্বরূপ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ রকমই ধারণা করতে পারে। ভৌতিক পদার্থের অবস্থা দেখে তাঁর অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। ভৌতিক পদার্থের মূল বিচ্ছিন্ন হতে পারে। ছিন্ন তরুলতার মতো তা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে, অথবা তাদের ভিতরকার উৎপত্তি-মূল জীবাংশ একেবারে ধ্বংসও পেতে পারে। কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপ এ সকল অবস্থা থেকে মুক্ত। তাই তিনি মহাসমুদ্রের মতো গভীর, অতলস্পর্শী ও অপরিমেয়। ভৌতিক দিকে থেকে তাঁর বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ সেই পূর্ণস্বরূপের অবস্থিতি হল অবাঙ্‌মানসগোচর এক অপার্থিব আনন্দলোকে।

শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধধর্মের পুণ্যস্থান প্রচুর। সাঙ সেই সব স্থানের প্রত্যেকটী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে নিলেন।

বার

তারপর সাঙ উত্তরপশ্চিমে কিছুদূর গিয়ে উপস্থিত হলেন কপিলাবাস্তুতে। কপিলাবাস্তুর পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে সেই জ্ঞানভিক্ষু শ্রমণ তাঁর সমস্ত পথের কষ্টকে সার্থক মনে করলেন। সেখানকার মাটী মাথায় নিয়ে প্রণত হলেন সাষ্টাঙ্গে।

সাঙ যখন কপিলাবাস্তুতে পৌছান তখন কপিলাবাস্তু নেপাল তরায়ের গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রায় অবলুপ্ত। তিনি সেই জংগলের মধ্যে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন—তথাগতের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন। দেখলেন—সেই অরণ্যের মধ্যে ইষ্টকরচিত বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। সেই সব প্রাসাদের মধ্যে একটী ছিল প্রকাণ্ড। সাঙ বুঝলেন সেটী ছিল মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রাসাদ। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সুগভীর শ্রদ্ধার সংগে সাঙ মনে করতে লাগলেন অতীতের কথা।

—ঐ বোধহয় সেই অন্দর মহল। বোধহয় ঐ মাঝখানকার প্রকাণ্ড ঘরটীতেই বিরাট সুবর্ণপালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে সেদিন সেই আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে নিদ্রিতা ছিলেন অপুত্রক রাজমহিষী মায়া দেবী। পুত্র লাভের আশায় গত এক সপ্তাহ ধরে নক্ষত্রোৎসবে দান-ধ্যান-ব্রতাদি ক্রিয়ায় তিনি পরিশ্রান্তা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন—এক শ্বেত-হস্তী আকাশের এক প্রান্ত থেকে নেমে এসে প্রবেশ করল তাঁর গর্ভে। তিনি গর্ভবতী হলেন। মায়াদেবীর ঘরের উত্তর-পূর্বদিকে ঐ যে স্তূপ সেখানে বৃদ্ধ ঋষিকল্প অসিত বলেছিলেন যে এ সন্তান দৈববলে বলীয়ান।

রাজা শুদ্ধোদনের আনন্দের অন্ত নাই। তাঁর নিজের, রাজ-মহিষীর ও রাজ্যের প্রতিটি লোকের বহু কালের আকাঙ্ক্ষা সফল

হবে। রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এক অতি সুলক্ষণযুক্ত দিব্যপুত্র সন্তান।

দশ মাস অতিক্রান্ত হবার মুখেই রাজকুল-প্রথা অনুসারে রাণীকে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠাবার আয়োজন করা হল। রাণীর পিত্রালয় কোলি নগরীতে। সেখানে যাবার পথ কিছু বন্ধুর। এই পথ আবার চলে গেছে লুম্বিনী নামে একটী বনের ভিতর দিয়ে। রাজা শুদ্ধোদন তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর পিত্রালয়ে যাবার উপলক্ষে সে পথ নতুন করে প্রস্তুত করলেন। তার পাশে পাশে বসে গেল মঙ্গল কলস আর কদলীবৃক্ষের সার। রাণীকে নিয়ে যাবার জন্য এক সোনার রথ নানা রত্ন দিয়ে সাজান হল। তারপর অসংখ্য সখী, প্রতিহারী আর রাজপুরুষ সঙ্গে নিয়ে রাণী একদিন পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন।

কপিলাবস্তুর কিছুদূরে উত্তর পশ্চিমে আছে এই লুম্বিনী উদ্যান। সাঙ মায়াদেবীর সেই গমনপথ অনুসরণ করে চললেন। লুম্বিনীর সমস্ত ভূমি সমস্ত অরণ্য অতি পবিত্র। কারণ সেখানেই প্রভু বুদ্ধ সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। মহারাজ অশোক সেখানে নির্মাণ করিয়েছিলেন এক স্তম্ভ—সেই স্মৃতিকে চিরকালের জন্যে অমর করে ধরে রাখতে। এই স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ ছিল ভগবান বুদ্ধের বাণী। সাঙ যেমন সেদিন সেই স্তম্ভটীকে চিহ্ন ধরে খুঁজে পেয়েছিলেন লুম্বিনীকে—তেমনি আধুনিক কালেও তরায়ের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্যে এই স্তম্ভটী থাকার জন্যেই লুম্বিনীকে খুঁজে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে।

লুম্বিনীতে দাঁড়িয়ে সাঙ মানস চক্ষে দেখতে লাগলেন মায়াদেবীর সেই আগমন। সমস্ত অরণ্য ছেয়ে আছে শাল, পিয়াল, তমাল আর অশোকে। তার মধ্যে মধ্যে আছে নানারকম বন-কুসুমের গাছ। রাণী অরণ্যে প্রবেশ করতেই যেন সেখানে বসন্তের আবির্ভাব হল। গাছে গাছে ফুটে উঠল ফুলের দল। অশোক আর শালের

গাছ ছেয়ে গেল ফুলে ফুলে। তাদের সুগন্ধে বনস্থলী যেন মাতাল হয়ে উঠল। পাখীদের আনন্দ-কলকাকলীতে দিগ্বিদিক ভরে উঠল। জলাশয়ে ফুটে উঠতে লাগল—রক্তকমলের দল।

মায়াদেবী বনের এই অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর সুবর্ণ রথ থেকে নেমে দাঁড়ালেন পথে সেই অপার্থিব সৌন্দর্যকে কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করতে। মায়াদেবীর হাতের কাছেই এক ফুলভারাবনত বৃক্ষশাখা বাতাসে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়ে যেন তাঁকে পরম সমাদরে আহ্বান করতে লাগল। রাণী প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। মায়াদেবীর ভগ্নী মহাগৌতমী—শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী তিনিও সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কাঁধের উপর বাঁ-হাতখানি রেখে ডান-হাত বাড়িয়ে পুষ্পলুব্ধা রাজমহিষী শাখাটিকে ভেঙে নিলেন। সেই ফুলভরা শাখা হাতে আনন্দবিভোর অবস্থাতেই মায়াদেবীর দক্ষিণপার্শ্ব দিয়ে নির্গমন করলেন দেবতাত্মা সিদ্ধার্থ।

অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষ যেন তাদের শির নত করে প্রণাম জানাল সেই মহাপ্রাণকে। আনন্দের মলয় সমীরণ বইতে সুরু করল।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠদেবতা ব্রহ্মা তাঁকে ধারণ করলেন। নাগরাজ বাসুকী আকাশে সহস্র ফণা বিস্তার করে উষ্ণ আর শীতল জলের ধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। সেই ধারায় দেবতাদ্বয় নবজাতককে স্নান করালেন। অরণ্যের চারদিকে উদাত্তমন্ত্রে বেজে উঠল স্বর্গীয় সঙ্গীত। পবনদেব বীজন করতে লাগলেন জাতকের অঙ্গে। সেই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। সেই নবজাতক শিশু বাহকদের হাত থেকে নিজেই মুক্ত হয়ে লাফিয়ে মাটীতে দাঁড়ালেন। তারপর উত্তর দিকে সপ্তপদ অগ্রসর হয়ে গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন—এই আমার শেষ জন্ম। এ জন্মের পর আমার আর কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আমি বুদ্ধ ও সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ।

ভগবান সিদ্ধার্থ যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, ঠিক সেই সময়েই জন্ম গ্রহণ করলেন তাঁর সহধর্মিণী গোপাদেবী, সহচর ও প্রধান শিষ্য আনন্দ আর তাঁর প্রিয় অশ্ব কণ্টক।

লুম্বিনীর উদ্যানে ভ্রমণ করতে করতেই সাঙের মনে পড়ল আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা।

কপিলাবাস্তুতে হলকর্ষণোৎসব। স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদন, স্বজন-পরিষদ-এর সঙ্গে সেই উৎসবে যোগদান করেছেন। সারা নগরী আনন্দমুখর। দিকে দিকে নতুন নতুন পত্রপুষ্পসজ্জা। কৃষিক্ষেত্রের রূপ সেদিন অপূর্ব সুন্দর। সেখানে সাজান হয়েছে সহস্র লাঙ্গল ও বলীবর্দ। আবালবৃদ্ধবনিতারা নতুন সাজে সেজে দেখতে গেছে সেই উৎসব। শিশু সিদ্ধার্থকে নিয়ে তাঁর ধাত্রীও গিয়েছে সেই উৎসব দেখতে। এক ছায়া-শীতল জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় রচিত হয়েছে শিশুর শয্যা।

তারপর নানান বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে উৎসব শুরু হল। রাজা আট শত লাঙ্গল ও বলীবর্দ বেছে নিয়ে কর্ষণ সুরু করলেন। অনুবর্তী হলেন নগরের সাত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাজার লাঙ্গলের শোভা অপূর্ব। সোনার পাতে মোড়া—হীরা-মুক্তা-খচা লাঙ্গলের ওপর প্রভাত-সূর্যের আলো পড়ে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। সেই শোভা দেখবার জন্য কুমারের ধাত্রী সব কিছু ভুলে কুমারকে একা ফেলে দৌড়ে গেলেন অপর দিকে। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। সূর্যও ঢলে পড়লেন পশ্চিম দিকে। এতক্ষণে ধাত্রীর হুঁস হল। সে যে শিশুকে সেই সকালবেলাতে একা জামগাছের ছায়ায় ফেলে এসেছে—এ-কথা মনে করে দারুণ অনুতাপ এল মনে। ভাবল দারুণ রোদে এতক্ষণ কুমার কতই না কষ্ট পেয়েছেন।

ধাত্রী সকালে কুমারকে ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমার শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন কাছে কেহই নাই। দূরে উৎসবের

কোলাহল। এই হল উপযুক্ত সময়। তিনি পদদ্বয় বিন্যস্ত করে যোগাসনে উপবেশন করলেন। তারপর গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

এদিকে অনুতপ্তা ধাত্রী আর পরিচারিকারা কুমারের নিকট এসে দেখলেন সেই শিশু যোগারূঢ় হয়ে বসে আছেন তাঁর শয্যার উপর। আর কি আশ্চর্য—জম্বুবৃক্ষের ছায়া সকালে যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবেই রয়েছে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত একটুও না সরে। তক্ষুনি রাজার কাছে সংবাদ গেল। রাজা শুদ্ধোদন অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন—সেই অলৌকিক দৃশ্য। তারপর মাথা নীচু করে বললেন—প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে নমস্কার করি।

লুম্বিনীর উদ্যান ভ্রমণ সমাপ্ত করে সাঙ আবার ফিরে এলেন কপিলাবাস্তুতে। আবার সেই ভগ্নপুরীর মধ্যে সন্ধান করে বেড়াতে লাগলেন—প্রভুর নানান স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে। কপিলাবাস্তুর ভাঙা প্রাসাদ আর অবলুপ্তপ্রায় রাজপথে যে কাহিনী এতদিন ঘুমিয়ে পড়ে ছিল সাঙের পাদস্পর্শে সে যেন এতদিন পরে তার পরিপূর্ণ চিত্র নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে বসল।

উৎসবমুখর নগরী। চারদিকে চোখ ধাঁধানো আলোর মালা। হাসি-হল্লা, নাচ-গান। রাজপ্রাসাদের প্রমোদ কাননে সে উৎসব জমে উঠেছে হাজারগুণ তেজে। রাজকুমারকে ঘিরে বয়ে চলেছে আনন্দের কলস্রোত। শত শত সুন্দরীর চটুল চরণে বেজে উঠছে নূপুরের নিক্বণ। সুমধুর কণ্ঠে প্রাণ-মাতানো সংগীত, লাস্যময় মদির কটাক্ষে আর ললিতপীবর দেহের ভঙ্গ-ভঙ্গিমায় তপস্বীরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। কুমার সে প্রমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন শত সখীর মধ্যে। হঠাৎ মনে পড়ল কিসের এ উৎসব।

কুমারের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

হাজার হাজার আলোর দীপ্তি চোখে ম্লান হয়ে এলো। উৎসবে ক্লান্ত হলেন যুবরাজ। মনে মনে বললেন—রাহুলং জাতন্তি বন্ধনং জাতন্তি। এ সংসার বন্ধনে আবার একটি গ্রন্থি পড়ল।—ভাল লাগল না উৎসবের সংগীত। নূপুরের নিক্কণ, সুন্দরীদের মোহমদির চক্ষের কটাক্ষ, পান ভোজন সব উপেক্ষা করে ভারাক্রান্ত মনে কুমার বার হয়ে এলেন প্রমোদ-উদ্যান থেকে।

সুন্দরী কিশাগৌতমী কুমারের রূপ-মুগ্ধা। মনে মনে বহুদিন ধরে দেবপ্রতিম কুমারের পায়ে দেহমন সমর্পণ করে বসে আছেন গৌতমী। উৎসবের সখীদের সঙ্গে তিনি যোগ দেন নি। প্রাসাদের একটী কক্ষে বসে দেখছিলেন প্রমোদমত্ত যুবরাজকে। মনের কথা মুখ ফুটে কোনদিন বলা হয়নি প্রাণের প্রিয়তমকে। পাছে ভাবেন প্রগল্‌ভা। পাছে প্রত্যাখ্যান করেন কুমার কিশার অন্তরের প্রেমকে।

যুবরাজকে উদ্যান থেকে ফিরতে দেখলেন গৌতমী। তিনি নেমে এলেন কুমারের চলার পথের ধারে। একটী প্রায়ান্ধকার স্থানে বসে বীণা বাজিয়ে গাইতে লাগলেন—

নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্‌সায়ং ঈদিসো পতীতি॥
(এই) দেব দুর্লভ প্রভুরে যে মাতা ধারণ করেছে ক্রোড়ে
যে পিতা জনম দিয়াছে ইঁহারে এই পৃথিবীর পরে।
পতিরূপে এই শ্রেষ্ঠমানবে পেয়েছে যে বিধুমুখী।
তাঁরাই হলেন প্রকৃত চরম পরম সুখেতে সুখী।

কুমার পথ দিয়ে যেতে যেতে থমকে একবার দাঁড়ালেন। কান পেতে সে গান শুনলেন। গানের কথাটির মধ্যে 'নিব্বুত' কথাটী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে আঘাত করল। তিনি কণ্ঠ থেকে রত্নহার খুলে দিলেন কিশাকে। কিশা মনে করলেন, প্রভু

বোধহয় তাঁকে অনুগ্রহ করেছেন। কৃতকৃতার্থ হয়ে গেল যুবতীর অন্তর।

কিন্তু 'নিব্বুত' কথাটী বার বার গুঞ্জন তুলতে লাগল কুমারের প্রাণের মধ্যে। নিব্বুত—চরম এবং পরম সুখ। কিসে সে সুখ পাওয়া যায়? ক্রমশঃ উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল কুমারেব মন। এই যে পার্থিব সুখ—এই যে ভোগবিলাস—এর শেষ আছে, সীমা আছে। এতে ক্লান্তিও আছে। কোথায় সেই চরম ও পরম শান্তি যার সমুদ্রের মতো গভীর জলে অবগাহন করে চিরশীতলতা লাভ করা যায়। যাতে একবার ডুব দিলে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-ভয়, জরা-ব্যাধি-বার্ধক্যের ভয় থাকে না। কোথায় সেই নিব্বুত? কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যায়। কুমার অস্থির চিত্তে অশান্ত হৃদয়ে কক্ষে ফিরে এসে পদাচারণা করতে লাগলেন। মনে পড়তে লাগল কিছুকাল আগের কয়েকটী ঘটনা:

রাজা শুদ্ধোদনের সাবধানতার অন্ত নাই। কুমারের জন্মক্ষণে ঋষি অসিত দেবল ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেছেন—এ কুমার যদি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ অথবা মৃতদেহ দেখে তবে এ নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।

রাজার যেমন সাবধানতার অন্ত নেই—তেমনি উদ্বেগেরও অন্ত নেই। কুমার রূপে কার্তিকেয়, ধনুর্বিদ্যায় পরশুরাম, সর্বশাস্ত্রে অসাধারণরূপে পারংগম। বিচারে, বুদ্ধিতে অপূর্ব পারদর্শী। এমন সন্তান সন্ন্যাসী রাজা ভাবতেও পারেন না সেকথা। দুটী চোখ তাঁর জলে ভরে আসে সেকথা ভাবতে। এদিকে মাতা মহাগৌতমীর নয়নের মণি কুমার। প্রজাপুঞ্জের অপার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁকে হারিয়ে জীবনই বৃথা।

রাজা শতসুন্দরীর ভিতর থেকে বেছে নিলেন যশোধারাকে। বিবাহ দিলেন কুমারের সংগে। আয়োজন করলেন অপার ভোগ-

বিলাসের। আদেশ দিলেন যেন কোনরকম দুঃখের চিহ্ন কুমারের সমুখে কেউ না নিয়ে যায়। মনকে ধরে রাখতে চাইলেন পার্থিব সুখের মধ্যে।

কিন্তু বিধির নির্দেশ অমোঘ।

সেদিন প্রমোদ-উদ্যানে চলেছেন কুমার রথে চড়ে। সারথি রাজ-পথ দিয়ে রথ হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। এমন সময় সম্মুখে কেমন করে না জানি এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ লোলচর্ম বৃদ্ধ এসে পড়ল। সে মূর্তি দেখে কুমার চমকে উঠলেন। দুঃখে তাঁর মনের ভিতরটা সহসা মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কিং সারথে। পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম উচ্ছুষ্কমাংস রুধির ত্বচ স্নায়ু নদ্ধঃ।
শ্বেত শিরো বিরল দন্ত কৃশাঙ্গ রূপঃ আলম্ব্য দণ্ডং ব্রজতেঽসুখং স্খলন্তঃ॥

হে সারথি মোরে বল এই নর কেন এত দুর্বল।
শুষ্ক মাংস, চর্ম রুধির, বিকল স্নায়ুর দল?
ঘন কালো কেন সাদা হয়ে গেছে বদন দন্তহীন
যষ্টির ভরে চলিতেছে পথ কষ্টে অঙ্গ ক্ষীণ?

সারথি উত্তর দিল—

এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতো ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু॥

হে দেব, এ নর জরা অভিভূত দুঃখ পতিত অতি
ইন্দ্রিয় ক্ষীণ, দেহ বলহীন তাই মন্থর গতি।
কর্মে শক্তি নাই এতটুকু তাই আত্মীয় জনে
উপেক্ষা করে যেন প্রাণহীন শুষ্ক বৃক্ষ বনে।

কুমারের সারা মন উন্মোথিত হয়ে বার হয়ে এল—জরাপি দুক্খা।

কদিন তিনি নিদারুণ চিন্তাগ্রস্ত রইলেন এই ভেবে—যে প্রত্যেকটী মানুষকে এই জরার কবলে পড়তে হবে। এই দুঃখভোগ করতেই হবে।

আর একদিন। কুমার আবার চলেছেন প্রমোদ-উদ্যানে। পথের সামনে পড়ল এক ব্যাধিগ্রস্ত লোক।

কুমার সারথিকে শুধালেন—

কিং সারথে! পুরুষরূপবিবর্ণগাত্রঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েভিবিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গশুষ্ক উদরাকুলপ্রাপ্তকৃচ্ছ্র মূত্রে পুরীষস্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে॥

কে এই পুরুষ শুষ্ক গাত্র হে সারথি মোরে বল।
এত বিবর্ণ বিকল অঙ্গ কেমন করিয়া হল?
কষ্টে বহিছে শ্বাস প্রশ্বাস, ব্যাকুল অশ্রুসিক্ত।
একি কুৎসিত! পুরীষে মূত্রে সারাদেহ অনুলিপ্ত।

সারথি উত্তর দিল—

এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো ব্যাধিভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
আরোগ্যতেজরহিতো বলবীর্য্যহীনো অত্রান বিপ্রশরণো হ্যপরায়নশ্চ॥

হে দেব, এ নর ব্যাধিগ্রস্ত পরম গ্লানিতে ভরা।
শক্তিবিহীন, আরোগ্যহীন, মৃত্যু আসিছে ত্বরা॥
কিছুতেই আর এই পুরুষের নাহিক পরিত্রাণ।
ক্ষণকাল পরে হে দেব ইহার বাহির হইবে প্রাণ॥

কুমার বললেন—

আরোগ্যতা চ ভবতে যথা স্বপ্নক্রীড়া ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ধীররূপং।
কো নাম বিজ্ঞ পুরুষো ইন দৃষ্টবস্থ্যাং ক্রীড়া রতিঞ্চ জনয়েৎ শুভ সংজ্ঞিতাং বা॥

স্বপ্নের মতো অলীক ইহার আরোগ্য লাভ করা।
মৃত্যুর হাতে এখনই এই মানব পড়িবে ধরা।
এই দুর্দশা, ব্যাধি ভয় দেখে কোন বা বিজ্ঞজন।
সুরতক্রীড়ায় আছে আনন্দ ভাবিতে পারে কখন?

সঙ্গে সঙ্গে কুমারের মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি বেজে উঠল—ব্যাধিপি

দুর্কথা। সেদিন উদ্যানে আর যাওয়া হল না। তিনি গভীরতর চিন্তা নিয়ে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

আবার একদিন। সেদিন কুমার আবার চলেছেন উদ্যান ভ্রমণে। পথে চোখে পড়ল এক মৃতদেহ।

কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কিং সারথে! পুরুষো মঞ্চোপরি গৃহীতো উদ্ধৃত কেশনখপাংশুশিরে ক্ষিপন্তি।

পরিচারয়িত্ব বিহরন্তু বস্তাড়য়ন্তো নানা বিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ॥

এলোমেলো চুল, পাংশু নখর পুরুষে মঞ্চোপর
শয়ন করায়ে কোথা লয়ে যায় ঐ জনাকত নর।
বুকে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিছে সকল ভুলি
বলহে সারথি কোথা যায় এরা উড়ায়ে পথের ধূলি?

সারথি উত্তর দিল—

এষোহি দেব পুরুষো মৃত্যু জম্বুদ্বীপে নহি ভূয় মাতৃপিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারাম্।

অপহায় ভোগগৃহ মাতৃপিতৃমিত্রজ্ঞাতিসঙ্গং পরলোক প্রাপ্তু নহি দ্রক্ষতি ভূয় জ্ঞাতিম্॥

এই পুরুষের মৃত্যু হয়েছে এই জম্বুদ্বীপে
হে দেব, এজন আর দেখিবে না দারা সুত প্রভৃতিকে।
পরলোকে চলে ছাড়ি ভোগগৃহ, সখা, আত্মীয়জন।
এই পৃথিবীতে এই নরে আর দেখিবে না কোন জন॥

শুনে কুমারের হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল। পরম দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে কুমার বললেন—

ধিক যৌবনেন জরয়া সমভিক্রুতেন, আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন
ধিক জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন, ধিক পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গৈঃ।

যদি জরা ন ভবেয়নৈব ব্যাধি র্ন মৃত্যুঃ তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুনঃজরাব্যাধিমৃত্যুনিত্যানুবন্ধাঃ, সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং ॥

যে রূপকান্তি হইবেই ম্লান যত কর প্রাণপণ।
যে যৌবনেতে জরা কীট ধরে ধিক্ সেই যৌবন ॥
যেই আরোগ্য পরাহত হয় ব্যাধির আক্রমণে।
সহস্রবার সেই আরোগ্য ধিক বলে মানি মনে ॥
যে জীবন নয় চিরকাল স্থায়ী ধিক্ ধিক্ সে জীবন।
ধিক বলি সেই বিজ্ঞ জনেরে রতি আসক্ত মন ॥
যদি কোনদিন আসে সেইদিন যদি বা এমন হয়
জরা ব্যাধি আর মৃত্যুর ভয় পৃথিবীতে নাহি রয় ॥
তবুও যে দেহী পঞ্চ ভূতেরে আছে আশ্রয় করে
তাহার কষ্ট কে করে নষ্ট এই পৃথিবীর পরে ?
কিবা আসে যায় যদি নাহি হয় জরা মৃত্যুর নাশ—
ইহ পরকালে তবুও জীবের কোথা মুক্তির আশ ?
হে সারথি, তুমি অশ্ববল্গা এবে সংযত কর
মুক্তি চিন্তা করিতে আমায় শুধু দাও অবসর ॥

তারপর সমস্ত দেহমন আলোড়িত করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন কুমার—মরনম্পি দুকৃখম্।

•

কুমারের বিষণ্ণভাব দিন দিন বাড়তে লাগল। সমগ্র জাগতিক পদার্থ, জাগতিক ক্রিয়ার মধ্যে তিনি দেখতে লাগলেন—সেই অনির্বাণ-দুঃখের প্রজ্বলন্ত শিখাকে। মনে মনে ভীষণ চিন্তিত হলেন—কেমন করে এই জ্বালার প্রশমন করা যায় ? পথ কী ? উপায় কী ?

একদিন দৈবযোগে কুমার সম্মুখে দেখলেন এক কাষায়ধারী

সন্ন্যাসীকে। প্রশান্ত, প্রসন্ন মূর্তি। আনন্দের আধার, পরমপবিত্র সৌম্যরূপ সন্ন্যাসীর।

তিনি সারথিকে শুধালেন—

কিং সারথে! পুরুষ শান্তপ্রশান্তচিত্তো নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী। কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী পাত্রং গৃহিত্বং ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥

কাষায় বসনে তনুখানি ঢাকা কে এই পুরুষ বল
প্রশান্তচিত সৌম্য মূরতি দৃষ্টি অচঞ্চল॥
উদ্ধত নহে, নহে উন্নত চলে আনন্দভরে
বলহে সারথি, কে এই পুরুষ ভিক্ষাপাত্র করে?

সারথি উত্তর দিল—

এষোহি দেবপুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী। প্রব্রজ্যপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমানো সংরাগদ্বেষবিগতো তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা॥

হে প্রভু এ জন জ্ঞানী সন্ন্যাসী ভিক্ষু ইহার নাম।
সুবিনীতাচারী হয়েছেন ইনি বর্জন করে কাম।
সর্বজীবেতে সমভাব এঁর রাগদ্বেষ কিছু নাই।
ভিক্ষালব্ধ অন্নে তুষ্ট সন্ন্যাসী ইনি তাই॥

এতদিনে কুমারের মনের মেঘ কাটল। সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর মনে এক পরম আনন্দের সঞ্চার হল! তিনি বললেন—

সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ, প্রব্রজ্যনাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা। হিতমাত্মনশ্চ পরসত্বহিতঞ্চ যত্র সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ॥

কী কথা সারথি শোনালে আমায় অপূর্ব রুচিকর।
কিবা আনন্দ দিয়ে গেল প্রাণে এই সন্ন্যাসী বর॥
জ্ঞানী জনে কয় সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসই হল পথ।
যেথায় শান্তি, যেথায় তৃপ্তি আনন্দ অবিরত॥

এর থেকে আর এ-ধরার মাঝে শ্রেয় কিবা আছে বল
আত্ম পরের হিত যেথা মেলে মেলে অমৃত ফল।

সানন্দচিত্তে কুমার সারথিকে বললেন—সারথি, রথ ফেরাও। মনে মনে বললেন—প্রব্রজ্যাই শ্রেষ্ঠ পথ।

কুমারের গভীর চিন্তা ভেঙ্গে গেল। দেখলেন উদ্যান-বিলাসিনীরা তাঁকে উদ্যানে না দেখতে পেয়ে তাঁরই খোঁজে সবাই এসে পড়েছে কক্ষে। কক্ষও সংগে সংগে প্রমোদকক্ষ হয়ে উঠল। আবার চলতে লাগল নৃত্য-গীত। বেজে উঠল লাবণ্যময়ী যুবতীদের হাতে বীণা। প্রমোদ-সংগীতে ঘর ভরে গেল। কুমার একবার ভেসে যেতে থাকেন সেই প্রমোদস্রোতে। আবার বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকেন—হায়, এ প্রমোদে চরম সুখ কোথায়? নিব্বুত—নির্বাণ সে তো এখানে পাওয়া যায় না। এতে যে কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে। এতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি কই?

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। আস্তে আস্তে সব সখীরা উৎসবক্লান্ত অঙ্গ ঢেলে দিতে লাগল সুখতন্দ্রার কোলে। কুমারের চোখে ঘুম নাই। প্রাণের এ জ্বালা মাথার মধ্যে অনন্ত নরকের চিতা জ্বালিয়ে রেখেছে। নিদ্রা কোথায়?

ঘরে সুগন্ধী তৈলাধারে দীপ জ্বলছে। চিন্তাতপ্ত চোখ দুটীকে কুমার একটু বিশ্রাম দিতে কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজলেন। কিন্তু একটু পরেই চোখ খুললেন। চেয়ে দেখলেন নিদ্রিত মদিরমত্তা সখীদের দিকে। নিদ্রার ঘোরে কারও অঙ্গবাস খসে পড়ে গেছে। কারও প্রকাণ্ড খোলা মুখ থেকে লালানিঃস্রাব হচ্ছে। বিকট দাঁতের সারি পর্যন্ত দেখা যায়। কারও বা হচ্ছে প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন। শিউরে উঠে কুমার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কী বীভৎস! যাদের একটু আগে কত না সুন্দরী, কত না মোহময়ী বলে মনে

হচ্ছিল—তারা এই! এদের সৌন্দর্য কতই না ভঙ্গুর। সব জড় দেহই তো দেখি এই কুৎসিত মাংসের পিণ্ড। হায় হায়—আমি কী ভ্রান্ত! আমি এতক্ষণ এরই মোহে মুগ্ধ হয়ে রয়েছি। নিত্য-সত্য-সুন্দরের দিকে আমার নজর পড়ল না। ধিক আমাকে! ধিক্কারে তাঁর সারা মন ভরে গেল। উঃ অসহ্য এ যন্ত্রণা। এ নরক থেকে উদ্ধার পেতে চাই। কোথায় এর পথ।

অশান্তচিত্তে ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন কুমার কক্ষের মধ্যে। মনের মধ্যে যেন এক বিষাক্ত বৃশ্চিক থেকে থেকে তার বিষদাঁতে কামড় বসাতে লাগল। তিনি একবার তাঁর স্ত্রীর ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন স্ত্রী গোপা, পুত্র রাহুল নিদ্রিত। উঃ বন্ধন! সর্বত্র বন্ধন! পালিয়ে এলেন কুমার সেখান থেকে। তারপর চঞ্চলপদে ঘরের বার হয়ে এলেন। ডাক দিলেন—কে আছ?

প্রহরী ছন্দক আজ্ঞাধীন অনুচর। সংগে সংগে প্রভুর কাছে এসে নতমস্তকে হাজির।

কুমার আজ্ঞা দিলেন—অশ্ব কণ্টককে বার করে নিয়ে এসো। আমি এখনই সংসার ত্যাগ করে যাব চরম ও পরম সুখের সন্ধানে।

ছন্দকের প্রথমে বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ে বলতে লাগল—প্রভু, আপনার একি ভ্রম! দেবীর মতো সুন্দরী স্ত্রী দেব-শিশুর মত পুত্র। অজস্র ধনসম্পদ, দাসদাসী, সখীসহচর, রাজসিংহাসন, এসব ছেড়ে পরম সুখের আশায় কুমার যাবেন কোথায়? কিন্তু তার এসব কথা কুমার কানেই তুললেন না। ছন্দক আজ্ঞা পালন করল।

কুমার কণ্টকের ওপর চড়ে বসলেন। প্রাণের মধ্যে শুধু অনির্বাণ শিখায় জ্বলছে জগতের দুঃখদাহের রূপটা। আর অন্তরে বাজছে নিব্বুত—নির্বাণ। অন্তরের সেই জ্বালায় তিনি অধৈর্য হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তাঁর প্রিয় বাহক কণ্টকের ক্ষুর ধারণ করল দেবতারা।

পাছে মাটীতে ঘর্ষণের শব্দ উঠে তোরণের প্রহরীদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সঙ্গে অনুসরণ করল ছন্দক।

সমস্ত রাজপ্রাসাদ উৎসবের শেষে পরম্ ক্লান্তির মধ্যে নিদ্রিত রইল। কুমার পিছনে ফেলে এলেন রাজধানী। সবার অলক্ষ্যে অন্ধকারে। মৌনসাক্ষী রইল কেবল আকাশের অগণিত নক্ষত্র। আর অনুচর ছন্দক।

কিন্তু এ সন্ন্যাসের পথেও অন্তরায় উপস্থিত। মার প্রলোভন রূপে কুমারের পথ রুদ্ধ করল। কোথায় যাও সিদ্ধার্থ? আর একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমায় সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়ে দেবো। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত করে দেব তোমার রাজত্ব। তুমি ফিরে এসো।

সিদ্ধার্থ বললেন—কে তুমি? কেন তুমি আমার এ শুভ সংকল্পে বাধা দাও?

মার বলল—আমি তো তোমার মঙ্গলই চাই। তুমি সংসারে ফিরে চল। সিদ্ধার্থ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন—

নাহং প্রবেক্ষি কপিলস্যপুর অপ্রাপ্য জাতি মরণান্তকরম।
স্থানাসনং শয়নচংক্রমণং ন করিষ্যেহং কপিলবস্তু সুখং।
যাবন্নলব্ধং বরবোধি ময়া অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম্॥

সংসার ছাড়ি সব মায়া ত্যজি পথেতে হয়েছি বার।
না আসিব এই কপিলবস্তু নগরে পুনর্বার॥
অজর অমর যাতে হয় নর যে বোধি পরাজ্ঞান॥
তারে না লভিয়া এই নগরীতে ফিরিবেনা মোর প্রাণ॥

সংকল্প শুনে মার দূর হল।

নিজের সংকল্পে অটুট হয়ে সেই রাতে কুমার তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। অতিক্রম করলেন ত্রিশ যোজন পথ। এসে পড়লেন অনোমা নদীর তীরে। ছন্দক অনুচর ঠিক পিছনেই আছে।

সিদ্ধার্থ এখানে অশ্ব থেকে নামলেন। অঙ্গ থেকে এক এক করে খুলে ফেলতে লাগলেন আভরণ—অঙ্গবাস। সব কিছু ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন, যাও ছন্দক—ঘরে যাও। পিতাকে বলো আমি সন্ন্যাস নিলাম। আমার জন্য তিনি যেন শোক না করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করে আমি আবার তাঁর কাছে ফিরে যাব।

ছন্দক কেঁদে উঠল। প্রভু এমন কঠিন আদেশ কেন আমাকে? আমি যে আপনার অনুচর। আমিও আপনার সঙ্গে সন্ন্যাস নেব। কুমার বললেন—ঘরে ফিরে গিয়ে পিতাকে সংবাদ দেওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। নাহলে তিনি আমার অন্য কোন অমঙ্গল আশংকা করবেন।

ছন্দক নতমুখে ফিরে গেল। ফিরে চলে গেল প্রিয় অশ্ব কণ্টক।

এবার কুমার তার রেশমের মতো কুঞ্চিত কেশদাম তীক্ষ্ণধার তরবারিতে কেটে ফেললেন। উড়িয়ে দিলেন আকাশে।

কুমারের সংকল্পে দৃঢ়তা দেখে আকাশে দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করে গাইতে লাগল—

ন রজ্যতে পুরুষবরস্য মানসং নভো যথা তম রজঃ ধূমকেতুভিঃ।
ন লিপ্যতে বিষয়সুখেষু নির্ম্মল জলে যথা নবনলিনং সমুদ্‌গতম্ ॥

আকাশে রয়েছে ধূমকেতু, ধূলি, মলিন অন্ধকার।
তবুও আকাশ সদাই বিরাট সদাই 'পরিষ্কার ॥
মহাপুরুষের মানস আকাশ সদা রহে নির্লিপ্ত।
নির্মল জলে কমল যেমন কখনও হয় না সিক্ত।

দৈববাণী শুনে সিদ্ধার্থের মনের দৃঢ়তা বেড়ে গেল শতগুণ। তিনি নির্জন বনপথ ধরে অনোমা নদীর তীর দিয়ে চলতে লাগলেন একাকী।

এমন সময়ে সমুখে দেখেন এক ব্যাধ। কাষায়বস্ত্র তার পরণে।

কুমার সুযোগ ছাড়লেন না। নিজের বহুমূল্য বস্ত্রখানি সেই ব্যাধকে দিয়ে মেগে নিলেন তার কাষায়।

এইভাবে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসীর বেশে সিদ্ধার্থ চললেন সমুখের পথে। মনে একমাত্র চিন্তা কী ভাবে বোধি লাভ করা যায়। যে বোধি পথ দেখিয়ে দেবে নিবৃ্বতের, নির্বাণের। ক্ষুৎপিপাসা তাঁকে এক রকম ত্যাগ করে গেল। অনশনে, অর্দ্ধাশনে তিনি হেঁটে চললেন অরণ্যের পর অরণ্য। লোকালয়ের পর লোকালয়।

তের

কপিলাবাস্তুর ধ্বংসাবশেষ দেখে সাঙ এলেন গণ্ডক নদীর তীরে কুশীনগরে। এই কুশীনগরের বর্তমান নাম হল কেশিয়া। এইখানে ভগবান বুদ্ধ পরিণত বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। হিউয়েন সাঙ এসে দাঁড়ালেন হিরণ্যবতী নদীর তীরে সেই জায়গায় যেখানে এক শালবীথিকার মধ্যে শুয়েছিলেন ভগবান তথাগত।

তাঁর নির্বাণ কাল আসন্ন।

দেখতে দেখতে সেই শাল বীথি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। পাশে ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য আনন্দ। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন সেই মহামানব আনন্দকে ডেকে বললেন—আনন্দ! শোক সংবরণ কর। দেখ এ জগতের কত দুঃখ। মানুষ যা কিছু ভালবাসে সব কিছুকেই তার একদিন ছেড়ে যেতেই হয়। এ হল বিশ্বচরাচরের নিয়ম। তুমি তো জান—যা নশ্বর, যা জন্মের ভিতর দিয়ে দেহ ধারণ করে—তাকে কোন না কোন সময়ে ধ্বংস পেতেই হবে। তবে কেন এ শোক? তুমি হয়তো ভাবছ তোমার প্রাণতুল্য প্রভু চলে যাচ্ছেন—তাই তোমার এ দুঃখ। কিন্তু শোন আনন্দ, আমার এই জীবদেহটাই তো তোমার প্রভু নয়—তোমার প্রভু হল আমার বাণী, আমার মত ও পথ। তারা তো অবিনশ্বর—তবে তুমি আজ কেন এত বিচলিত? বলতে বলতে সেই মহাপুরুষের নরদেহ থেকে বার হয়ে এল এক দিব্যজ্যোতি। রাত্রিশেষে সেই জ্যোতি নবোদিত সূর্যের তেজের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল।

কুশীনগরের মল্লরাজারা আর তাঁর অন্যান্য ভক্ত শিষ্যরা সেই নরদেহ ভস্মীভূত করলেন কুশীনগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে।

কুশীনগর ত্যাগ করে সাঙ এবার এলেন বিখ্যাত বারাণসী সহরে। বারাণসীর খ্যাতি ভারতে চলে আসছে বহু প্রাচীন যুগ

থেকে। বিশেষ করে গঙ্গা তীরবর্তী কাশী বহু দিন থেকে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। এ হল শৈব ও শাক্তদের উপাসনার একটী শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। এখানে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির অসংখ্য। এখানকার অধিবাসীরা বেশীরভাগই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। সাঙ শৈবদের উপাস্য দেবতা বিশ্বনাথদেবের মন্দির দেখলেন। মন্দিরের আড়ম্বর, তার রাজোচিত ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরিক মহিমা সাঙকে মুগ্ধ করল। তিনি লিখেছেন—বিশ্বনাথ দেবের মূর্তি এত সুন্দর ও বিস্ময়োদ্দীপক যে দেখলে মনে হয় পাথরের দেবতা জীবন্ত হয়ে সেখানে বিরাজ করছেন।—বৌদ্ধ সাঙের মুখে এ ধরণের উক্তি বিস্ময়জনক নয় কী?

কিন্তু বারাণসীতে বৌদ্ধ সাঙের আকর্ষণেরও বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে হল সারনাথ।

এই সারনাথে প্রভু শাক্যসিংহ প্রথম আবর্তিত করেন তাঁর ধর্মচক্র। এখানকার মৃগদাব উদ্যানে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় তাঁর নির্বাণের বাণী। সারনাথের প্রত্যেকটী স্তূপের মধ্যে বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি দেখে বেড়ালেন হিউয়েন সাঙ। মনে তার উদিত হতে লাগল প্রভু বুদ্ধের শত স্মৃতি।

বোধি লাভ করেছেন সিদ্ধার্থ অতি কঠোর তপস্যার দ্বারা। তিনি হয়েছেন বুদ্ধ, পরাজ্ঞানী। মন তাঁর ভরে গেছে আলোতে। সেই আলোতে তিনি পথ দেখতে পেয়েছেন নির্বাণের—জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু চংক্রমণের অবসানের।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি ভাবলেন—স্বার্থপরের মতো এ জ্ঞান নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে এই জ্ঞানের অংশ। প্রত্যেকটী মানুষকে দেখাতে হবে মুক্তির পথ। এই মনে করে তিনি উরুবিল্ব গ্রাম ছেড়ে যাত্রা করলেন আরাঢ়-

কালামের উদ্দেশে। কিন্তু পথে সংবাদ পেলেন আরাঢ়কালামের পরলোক প্রাপ্তি ঘটেছে বহুদিন পূর্বেই।

তখন ভাবলেন যাই রাজপুত্র রুদ্রকের কাছে। তিনিও যোগ-মার্গে উন্নীত হয়েছিলেন অনেকখানি। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছবার পূর্বরাত্রেই রুদ্রক ইহলীলা সংবরণ করলেন।

বুদ্ধ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তারপর সব চিন্তা বিসর্জন দিয়ে যাত্রা করলেন বারাণসীর পথে।

বারাণসী হল যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াদির জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসের জায়গা।

পথে দেখা হল আজীবক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী উপকের সঙ্গে। উপক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সন্ন্যাসী, আপনার মুখে প্রশান্ত দিব্য-জ্যোতি ভেসে উঠতে দেখছি। আপনার গুরু কে? আপনি কোন মতের অনুসরণ করেন?

বুদ্ধ বললেন—আমি পরিবর্তনশীল জগতের সকল বিধি লঙ্ঘন করেছি। যে বিধি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় পরিচালনা করে সেই বিধির মূল তত্ত্ব এখন আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। আমি সকল কামনা বাসনাকে পরাজিত করেছি। আমার গুরু কেউ নাই। আমি নিজের আত্মশক্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোগত বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে সংসার ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত হয়েছি। নির্বাণ এখন আমার অধিগত।

উপক এই কথা শুনে একটু শ্লেষের হাসি হেসে ভিন্ন পথ ধরলেন। বুদ্ধ এলেন বারাণসীতে।

সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বারাণসীর মৃগদাব উদ্যানে অসংখ্য বৃক্ষবীথির আড়ালে আড়ালে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে। সন্ধ্যার সময়ে ধীরে ধীরে বুদ্ধ এসে পৌছালেন মৃগদাবের ঋষিপত্তনে। সেখানে তাঁর পূর্বপরিচিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ সন্তান

আগে থেকেই বাস করছিল। তারা সবিস্ময়ে দেখল এক দিব্য-জ্যোতির্ময় পুরুষ ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মূর্তি নিকটে আসতেই তারা বুঝতে পারল—এ হল সিদ্ধার্থ। তখন তারা একটু ব্যঙ্গ করে বলল—কী সিদ্ধার্থ, এখন কী যোগসাধনা ছেড়ে সুখ-সাধনায় মন দিয়েছ ? শরীরটা তো দিব্যি উজ্জ্বল দেখছি। সন্ন্যাসী হয়ে ভাল আহারই জুটছে তাহলে।

বুদ্ধ নিজের মধ্যে নিজেই বিভোর ছিলেন। ব্রাহ্মণদের কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়ে আনন্দোৎফুল্লস্বরে তিনি বললেন—বন্ধুগণ ! আজ আমি অমৃতনির্ঝরের সন্ধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আজ আনন্দের দিন। এসো সেই অমৃতপান করে ধন্য হও। দেখ, জগতে দুই চরম পথের কোনটাই ফলপ্রসূ নয়। এক পথে জীবকে অসংখ্য পাপে প্রলোভনে সংসার নরকে দগ্ধ করে। আর একপথে জীব কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে শরীর পাত করে। কিন্তু তাতে লাভ কী হয় বল ? আমি যে পথ দেখেছি সে হল জ্ঞানের পথ। সেই পরাজ্ঞানের বীজমন্ত্রটাই হল অমৃতের উৎস। এস সে মন্ত্রের ফল গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণ সন্তানরা সিদ্ধার্থের অলৌকিক রূপে আর সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসে ভরা কথায় মুগ্ধ হল। তারা সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে বসে এই মৃগদাবে ভগবানের বাণী সর্বপ্রথম শুনতে সুরু করল।

বুদ্ধ বললেন—সত্য চার রকমের। প্রথম হল—দুঃখ, দ্বিতীয় হল—এই দুঃখ উৎপত্তির কারণ, তৃতীয় হল—দুঃখ-নিরোধ, আর চতুর্থ হল—দুঃখ নিরোধের উপায়। দেখ—জন্মে মানবের দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, ব্যাধি-বার্ধক্যেও দুঃখ। এদের আমরা জ্ঞানত অপছন্দ করি। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ—আমরা এসবেই আসক্ত হয়ে আছি। এই সব দুঃখের কারণ হল তৃষ্ণা। তৃষ্ণা থেকেই জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, বার্ধক্য। এই তৃষ্ণার কোন শেষ নাই। তৃষ্ণা থেকেই তৃষ্ণার

উৎপত্তি। আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রলোভন। এ তৃষ্ণা, এ আকাঙ্ক্ষা, এ প্রলোভন কোনদিন শেষ হবার নয়। পূর্ণ হবার নয়। আগুনে ঘৃতাহুতির মতো এ নিত্য বর্ধমান।

—তাই দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পেতে হলে হতে হবে—তৃষ্ণা-শূন্য, কামনা-বাসনা-পরিত্যক্ত। এই তৃষ্ণা ও কামনা-বাসনাকে জয় করতে হলে—সকল বাক্যে, সকল কার্যে, সকল চিন্তায়, আচার-আচরণে—নির্মল পরিশুদ্ধ হতে হবে। মনকে মার্জিত করে সেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি আরও বললেন—এই চতুর্বর্গসত্য সাধকের মনে, ধার্মিকের মনে—বার বার আবর্তিত হয়। একবার আসে দুঃখবোধ তার পরই আসে তার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা। অতঃপর দুঃখ নিরোধ করবার জন্য প্রচেষ্টা ও তার উপায় চিন্তা। এরা চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে সাধকের, তপস্বীর মনের মধ্যে নাড়া দিতে থাকে।—ব্রাহ্মণ সন্তানরা সেকথা শুনে সেখানে সর্বপ্রথম বুদ্ধের চতুর্বর্গ শিষ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বর্গ-সত্যের প্রতীকরূপে তৈরী হল 'ধর্মচক্র'। তারা সেই মৃগদাব উদ্যানে সর্বপ্রথম ধর্মচক্র আবর্তিত করল।

এই বারাণসীতে বুদ্ধ কৌণ্ডঞ্ঞ, ভদ্দিয়, বপ্প, অচ্ছসজি, মহানাম প্রভৃতি তাপসদের অর্হত্বে দীক্ষা দান করেছিলেন।

এই মৃগদাবে অবস্থানের সময়েই আরও একটী ঘটনা ঘটে। যস নামে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীপুত্র বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে বারাণসীতে বাস করতেন। তাঁর বাস করার জন্য শীতাবাস, গ্রীষ্মাবাস আর বর্ষাবাস—তিন চমকপ্রদ প্রাসাদ লোকের চোখকে ধাঁধিয়ে দিত। তাঁকে সব সময়ে ঘিরে থাকত অসংখ্য সুন্দরী যুবতীদল। নাচে-গানে-প্রমোদে-উল্লাসে তাঁর ঘর থাকত সব সময়ে মুখরিত। একদিন সেই যুবতীদের মধ্যে তিনি এক বীভৎস রূপ দর্শন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপদ—বিপদ—বলে চীৎকার করতে করতে তিনি পাগলের মতো পথে বার হয়ে

এলেন। তারপর দৌড় দিয়ে মৃগদাবের দিকে আসতে লাগলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ যসকে অভয় দিয়ে বলে উঠলেন—ভয় নাই, ভয় নাই, সত্যের শরণ লও। সব বিপদ এখনই দূর হবে।

যস্ সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের শিষ্যত্ব মেগে নিলেন। শুধু যসই নয়—তাঁকে ফিরাতে এসে তার বাপ-মা, স্ত্রী-আত্মীয়-স্বজন সবাই বুদ্ধের মধুর বাণীতে সম্মোহিত হল। তারাও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

এই বারাণসীতে প্রভু জাতকের বেশে জন্ম নিয়েছেন বহুবার। এদিক থেকেও বারাণসী বৌদ্ধদের আদরের স্থান। বারাণসীর বিভিন্ন পুণ্যস্থানগুলি দেখা শেষ করে তিনি ফিরে চললেন বারাণসী থেকে। এলেন বৈশালী নগরে। এখানেও বুদ্ধের বহুস্মৃতি বর্তমান। বৈশালী দেখে সাঙ এলেন মগধে।

মগধ কয়েক শতাব্দী ধরে ছিল বৌদ্ধধর্মের পুণ্যপীঠস্থান। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের পথেরধূলি—যাতে মিশে আছে মহামতি অশোকের পুণ্যপাদস্পর্শ—সাঙ তা ছুঁয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। অশোকের নির্মিত বহু স্তূপ ও গম্বুজ যারা বুদ্ধের বাণী নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বহুকাল থেকে—সাঙ সে সবগুলি দেখলেন। পাটলীপুত্র দেখে তিনি গেলেন বুদ্ধ গয়ায়।

চৌদ্দ

বুদ্ধ গয়ায় বোধিদ্রুমের তলায় দাঁড়িয়ে সাও তাঁর অন্তরলোকে দেখলেন—সিদ্ধার্থের সেই অতি অদ্ভুত তপস্যা আর নমুচি মারের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ।

সন্ন্যাস নিয়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে চলেছেন পথে দেখা আরাঢ়-কালামের সঙ্গে। সন্ন্যাসী আরাঢ়কালাম যোগী। তিনি ধ্যানমার্গের চতুর্থ স্তর 'অকিঞ্চনায়তন'এ তখন অবস্থান করছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে বসে যোগ ও প্রাণায়াম সাধন করতে লাগলেন কিছুদিন। সিদ্ধিলাভ করতেও তাঁর খুব বিলম্ব হল না। কিন্তু এতে তাঁর নির্বাণ লাভ হল না।

রাজপুত্র রুদ্রকের যোগাশ্রম। সেখানে সাত শত শিষ্য নিয়ত যোগশিক্ষা করেন। সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়ে উপস্থিত হলেন। শিক্ষা করতে লাগলেন যোগ। কিন্তু তাতেও নির্বাণ মেলে কই?

একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হল—এ শিক্ষার দ্বারা নির্বাণ লাভ অসম্ভব। আপনি পথ না দেখলে অপরে পথ দেখাবে এ অতি অসম্ভব কথা। যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি সিদ্ধার্থ রুদ্রকের আশ্রম ছেড়ে পাহাড় অতিক্রম করে চলে গেলেন ওপারে উরুবিল্ব গাঁয়ে। সেখানে নির্জন অরণ্যের ধার দিয়ে নিঃসঙ্গ নিরঞ্জনা কুল কুল করে বয়ে চলেছে। অতি স্নিগ্ধ প্রশান্ত একটা পবিত্র ভাব যেন এখানকার প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। সিদ্ধার্থ ভাবলেন—এই হল ধ্যানের আসন পাতবার উপযুক্ত স্থান।

এক দেবতাত্মা দ্রুমের তলায় তিনি বেছে নিলেন তাঁর আসন—নিরঞ্জনার তীরে। তারপর পদ্মাসনে বসলেন ধ্যানে। পরম গভীর সে ধ্যান। জাগতিক যত কিছু অনুভূতি ধীরে ধীরে এক সময়ে লয় পেয়ে গেল সিদ্ধার্থের মন থেকে। খুলে যেতে লাগল ভিতরের

তৃতীয় নেত্র। দেহের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল—ভিতরে দেখা দিতে লাগল প্রথম প্রজ্ঞার উষালোক। তন্ময় হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। জড় দেহটার কথা আর মনেই রইল না।

নিদ্রা নেই, আহার নেই, প্রকৃতিগত সকল অভ্যাসই পরিত্যক্ত। আছে শুধু গভীর অন্ধকারে ভরা দুঃখানুভূতির ওপর ফুটন্ত জ্যোতির রক্তকমল—বুদ্ধ-মানস। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কেটে গেল। দেহ জীর্ণ হয়ে গেল। কঙ্কালসার বিবর্ণ হয়ে গেল সেই সুকুমার দেবনিন্দিত তনু। হস্তপদ সব শিথিল অবশ হয়ে এল। পদ্মপলাশের মতো নেত্র দুটী প্রবেশ করল কোটরে। প্রাণ কণ্ঠাগত। কিন্তু একি ? এখনও তো নির্বাণের সন্ধান পেলাম না। সেই চরম পরম সুখ। সেই নিব্‌ভূত, নিব্বুত। সে কোথায় ? তার জন্য সিদ্ধার্থের প্রাণ-পণ। হয় মন্ত্রের সাধন না হয় এ ছার দেহের পাতন।

অবসন্ন দেহে সিদ্ধার্থ—নিরঞ্জনায় স্নান করলেন। মন বড় ভারাক্রান্ত। এখনও কোথায় বন্ধন ? কোথায় লুকিয়ে আছে কী এক বিষম ত্রুটি তা কিনা বোধিলাভের পথে হচ্ছে পরম অন্তরায় !

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হলেন সিদ্ধার্থ। এমন সময় শ্রেষ্ঠী-কন্যা সুজাতা—দেবকন্যার মতো পরমান্ন এনে দিলেন সিদ্ধার্থকে। দেবীর করুণা যেন মানবীর আকারে নেবে এল। সিদ্ধার্থ দু চোখ ভরে দেখলেন সেই করুণাময়ীকে।

হঠাৎ মনে হল—পেয়েছি সেই ত্রুটির মূলকে। সেই কামনার লেশ—সে তো এখনও মন থেকে যায় নি। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে বিচার করলেন সিদ্ধার্থ। নারী আর অন্ন—এই দুই কষ্টিপাথরের ওপর একবার নিজের মনকে যাচাই করে নিলেন তিনি।

এবার সম্যকরূপে কামনা জয় করবার জন্য আসন গ্রহণ করলেন সিদ্ধার্থ। শরীর যত ক্ষীণ—মন তত দৃঢ়। এ এক অপূর্ব দৈব-

শক্তি। এবারকার সংকল্প আরও দৃঢ়। সিদ্ধার্থ আসনে বসে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

ইহাসনে শুশ্বতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ং মে যাতু।

এই আসনেতে বসিয়াছি আমি ত্বক্ যদি খসে যায়
অস্থি মাংস মজ্জা প্রভৃতি কিছু নাহি থাকে গায়।
তবুও সিদ্ধি না লভিয়া আমি উঠিব না কোন মতে
চরম পরম পবিত্র বোধি শুধু যাব সেই পথে।

মার সে সাধনায় বাধা দিল। এল তার সহস্র অনুচর সৈন্যদল। প্রথমে তাদের মায়ায় ঘটতে লাগল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বজ্র-বিদ্যুৎ। সকল বৃক্ষ উৎপাটিত হল—কিন্তু যে বোধিদ্রুমের তলায় সিদ্ধার্থের আসন—তা রইল অটল অচল।

অতঃপর অগ্নি-বৃষ্টি, ধূলি-বৃষ্টি। তাতেও সিদ্ধার্থের যোগ ভঙ্গ হল না। এর পর শাণিত ক্ষুরধার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে লাগল তাঁর প্রতি। কিন্তু অপূর্ব যোগপ্রভাবে সে সব তাঁর শরীরেই স্পর্শ করল না। মারসেনা পরাজিত হতে—মার নিজে এক বিরাট দিগ্‌গজে আরোহণ করে সিদ্ধার্থের সমুখে এল। অতিশয় রুক্ষকণ্ঠে সিদ্ধার্থকে বলল—সিদ্ধার্থ, এ আসন তোমার জন্য নয়। এ আমার। এখনই উঠে যাও এখান থেকে।

এদিকে মার সৈন্যরা সিদ্ধার্থের স্নেহ-মমতার রজ্জু ধরে টানাটানি সুরু করে দিল। কেউ এল স্ত্রী গোপার রূপে, কেউ এল পুত্র রাহুলের রূপে, কেউবা সুন্দরী সখী রূপে—সিদ্ধার্থকে আসন থেকে টলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। সিদ্ধার্থ কঠোর যোগ-প্রভাবে নিজ আসনে আরূঢ় থেকে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। শেষে মার বলল—

কিসো ত্বমসি ত্বুব্বণ্ণো, সন্তিকে মরণং তব,
সহস্সভাগো মরণস্স, একংয়ো তব জীবিতং।
জীবং ভো জীবিতং সেয্যো, জীবং পুঞ্ঞানি কাহসি॥

চরতো চ তে ব্রহ্মচরিয়ং অগ্‌গিহুত্বং চ জুহতো।
পহূতং চীয়তে পুঞ্‌ঞং কিং পধানেন কাহসি।
দুগ্‌গো মগ্‌গো পধানায় দুক্করো দুরতিসম্ভবো॥

তুই হয়েছিস্ কৃশ বিবর্ণ সমুখে মরণ দেখ
সহস্রভাগ মরণের আশা জীবনের আশা এক।
জীব হয়ে যদি জন্ম হয়েছে—বাঁচার চেষ্টা কর
সেই হবে তোর বিশেষ পুণ্য—সবচেয়ে বড় বর।
ব্রহ্মচর্যে অগ্নিহোত্রে অশেষ পুণ্য আছে।
এখন তো তুই প্রাণে বাঁচ—ফিরে এ সব করবি পাছে।
বোধি লাভে হবে কিবা ফল বল কি পাবি ইষ্ট বর।
তার পথ অতি দুরতিক্রম্য, দুর্গম, দুশ্চর॥

সিদ্ধার্থের সিংহনাদ ধ্বনিত হল—

পমত্ত বন্ধু পাপিম্ য়েনত্থেন ইধাগতো?
অনুমত্তেনপি পুঞ্‌ঞেন অত্থোময্হং ন বিজ্জতি।
য়েসঞ্চ অত্থো পুঞ্‌ঞানং তে মারে বত্তুমর্হতি॥

... ...

তস্ স সেবং বিহরতো পত্তস্ সুত্তমবেদনং।
কামে না পেক্‌খতে চিত্তং পস্‌স সত্তস্‌স সুদ্ধতং॥

ওরে প্রমত্তজনের বন্ধু চির পাপী দুরাচার
কি কারণে তুই এসেছিস্ হেথা পরম নারক মার॥
অন্তরে মোর এতটুকু নাই পুণ্য বাসনা লেশ।
যে জন পুণ্যপিপাসু তাহারে দিস তোর উপদেশ॥

... ...

আমি পৌঁছেছি যেই মহাভাবে সেথায় বেদনা নাই
কাম ক্রোধে চিত আসক্তিহীন তুষ্ট সর্বদাই।
প্রজ্ঞার আলো জ্বলিছে হৃদয়ে মানস তিমির-হর।
প্রশান্ত মোর সত্বাবস্থা তুই দর্শন কর॥

মার পরাজিত হল। লজ্জায় ক্ষোভে মার বলল—

সত্তবস্সানি ভগবন্তং অনুবন্ধিং পদাপদং।
ওতরাং নাধিগচ্ছিস্সং সম্বুদ্ধস্স সতিমতো॥
মেদবন্নং চ পাষাণং বায়সো অনুপরিয়গা।
অপেত্থ মুদু বিন্দেম অপি অস্সাদনা সিয়া॥
অলদ্ধা তত্থ অস্সাদং বায়সত্তো অপক্কমি।
কাকো ব সেলং আবজ্জ নিব্বিজ্জপেম গোতমং॥

সাতটী বছর ঘুরিতেছি আমি এ ভগবানের পাছে।
দূর হতে কত দেখায়েছি ভয় ঘেঁসিতে পারিনি কাছে॥
কতো প্রলোভন দেখায়েছি যাতে কাম হয় উচ্ছল।
অপূর্ব দেখি দৃঢ়তা মনের কভু নহে চঞ্চল॥
মেদের বরণ পাষাণ দেখিয়া যেমন বায়স ভাবে।
নিশ্চয় এটা হইবে নরম ঠোকর বসান যাবে॥
কিন্তু কঠোর পাষাণের কাছে খাটে নাকো জারিজুরি।
মোর অবস্থা কাকের সমান বৃথা মরিলাম ঘুরি॥
বজ্রের সম গৌতম মনে নাহি কাম লোভ ভয়।
আমি চলিলাম হেঁট মুখ হয়ে লয়ে শত পরাজয়॥

মার বিজয় সমাপ্ত হল। সিদ্ধার্থ প্রগাঢ়তর ধ্যানের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগলেন।

এবার আর মনের সঙ্গে মারের সঙ্গে যুদ্ধ নাই। নাই অসংখ্য মারসেনার সঙ্গে রজ্জু টানাটানি। শত জ্বালা, সহস্র আঘাত প্রতিঘাত সব শেষ হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ ডুবে যেতে লাগলেন মহাসমুদ্রের সুনীল স্বচ্ছশান্ত শীতল শান্তিবারির মধ্যে। তলিয়ে যেতে লাগলেন মহাআনন্দময় এক অব্যক্ত অনুভূতির মধ্যে।

মহাসমুদ্র! শান্তির মহাসাগর! যেখানে পার্থিব বাক্যসকল

স্তব্ধ হয়ে যায়। পার্থিব মন যে সাগরের নাগাল পায় না—সেই পরম ও চরম আনন্দের সাগর। সেই মহাপরিনির্বাণ—সেই নিভ্‌ভৃত। জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত দুঃখের দাহে জ্বলে পুড়ে খাক্ হওয়ার চির-সমাপ্তি। বাসনার শিখাকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেওয়া।

মনে একি আলো! অপার জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে বসে পরম প্রজ্ঞালব্ধ বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সিদ্ধার্থ অনুভব করলেন—তিনি আজ বুদ্ধ! পরাজ্ঞানী। নির্বাণের পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সংগে সংগে খুঁজে পেয়েছেন এই জাগতিক মহা-দুঃখের কারণ।

বুদ্ধের মুখে বাণী বিঘোষিত হয়ে উঠল—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেষন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকুটং বিসংখিতং॥
বিসংখার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥

এই পৃথিবীতে কত রূপে আমি জন্মেছি কতবার।
তৃষ্ণার জ্বালা পুরাবার লাগি এসেছি পুনর্বার॥
যতবার আমি জন্মেছি গেছি বৃথা সুখ খুঁজে খুঁজে।
সব ছেড়ে শুধু দিন কাটায়েছি কামনা বাসনা পুজে॥
এবার জেনেছি পরম সত্য তৃষ্ণা জন্ম মূলে।
কামনা বাসনা দেহ গৃহ রচে, বাস করি সব ভুলে॥
প্রজ্ঞার আলো জ্বলেছে মনেতে ঘুচেছে অন্ধকার।
তৃষ্ণা রাখিয়া এই গৃহ আমি কভু রচিব না আর॥
গৃহের স্তম্ভ সব ভেঙ্গে দিছি ভেঙেছি ঘরের চাল।
দূরে ফেলে দিছি যত কামনার বাসনার জঞ্জাল॥

তৃষ্ণা বিহীন আসক্তিহীন শুধু নির্বাণকামী।
কঠোর তপেতে লভিয়াছি বোধি পরম বুদ্ধ আমি॥

এই বুদ্ধগয়া হল সেই প্রাচীন উরুবিল্ব। আর এই হল সেই দেবতাত্মা বোধিদ্রুম। এরই তলে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করার পরও তিন সপ্তাহ কাল অবস্থান করেছিলেন। সাঙ সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে প্রণাম নিবেদন করল সেই বোধিদ্রুমকে আর তাঁর প্রভু বুদ্ধকে। তিনি লিখেছেন—এই বৃক্ষের কাণ্ডটী হল শ্বেত ও হরিদ্রাভ। এর পত্রের রং সবুজ। কিন্তু কী গ্রীষ্ম, কী শীত কখনও এ দ্রুমের পত্র মোচন হয় না। কেবল বৎসরের সেই একটী দিন—যেদিন বুদ্ধ মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন—সেই দিনই এর সমস্ত পত্র ঝরে পড়ে। পরের দিন আবার সারা গাছে নতুন সবুজ পাতা গজিয়ে উঠে।

হিউয়েন সাঙ বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আর তাঁর অন্তরের ভক্তি অর্ঘ, ঢেলে দিতে লাগলেন সেই স্থানগুলির ওপর।

তারপর গয়া জিলার কতকগুলি অরণ্য পর্বত অতিক্রম করে সাঙ এসে পড়লেন বৌদ্ধদের সেই বহুবিখ্যাত জ্ঞানতীর্থ—নালন্দাতে।

পনের

প্রাচ্যের মিলন ক্ষেত্র, সারা এশিয়ার কৃষ্টি ও জ্ঞানচর্চার পুণ্য পাদপীঠ নালন্দার তখন এক গৌরবময় দিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে হয় এর ছাত্রদের আগমন। তাদের স্থান দেবার জন্যে তৈরী হয়েছে দশটি বৌদ্ধ বিহার। এই সব কটী বিহার ঘিরে আছে ইষ্টক-প্রাচীরের বেষ্টনী। এই সব বিহারের মধ্যে আছে নানা রকমের বাসকক্ষ। ছাত্রদের বাসের জন্য আছে ঠিক আধুনিক প্রথার মতো এক, দুই, তিন বা চারটী করে শয়নবেদী—এক একটী কক্ষে। একসারি ছাত্রাবাসের সঙ্গে আছে একটী করে পরিদর্শকের ঘর। পরিদর্শক হতেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। সাঙ সে সকল কথা তাঁর বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছেন—বর্তমান খননকার্যের ফলে মাটীর তলা থেকে হুবহু সেই রকমের শিল্প ও কারুকার্যময় নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আজ আমাদের চোখের সমুখে দৃশ্যমান। সাঙ লিখেছেন—প্রাচীর বেষ্টনীর পরেই আছে বিস্তৃত পরিখা। পরিখার জল কাকচক্ষু। তাতে ফুটে আছে অজস্র নীলপদ্ম। তাদের প্রত্যেকটি বিকশিতবৃতি। বিহারের মধ্যে ফুটে আছে হেমদ্যুতি কর্ণিকারপুষ্প। তার আভায় সারা বিহার যেন আলোকময়। বিহারের ঠিক বাইরেই আছে ছায়া-সুশীতল আম্রকুঞ্জ। নালন্দার ছাত্র সংখ্যা হল দশ হাজার। এরা সবাই মহাযান মতবাদের অনুসরক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারকম প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সুরু করে চতুর্বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, যৌগিক-প্রক্রিয়া ও অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রায় এক শতটী চত্বর জুড়ে ছাত্ররা সব সময়েই তাদের শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ সহকারে পাঠে রত থাকে। এক মুহূর্ত তারা সময় বৃথা নষ্ট করে না। এই সব পরম ধার্মিক, আচারশীল, ন্যায়নিষ্ঠ শ্রমণদের সঙ্গে বাস করার ফলে ছাত্ররা একটী আদর্শবান, সংযত ও

পরিশুদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।· আর এই কারণেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ সাত শতাব্দী কালের ইতিহাসে অসদাচারী বিধিনিষেধ উপেক্ষাকারী একটী ছাত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেশের রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রীতিমতো শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকেন।

রাজা একশত গ্রামের রাজস্ব নালন্দার সর্ববিধ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। এছাড়াও প্রতিদিন দুইশত গৃহস্থ প্রচুর চাল, দুধ ও মাখন বিশ্ববিদ্যালয়কে উপঢৌকন পাঠিয়ে থাকে। রাজার এই বদান্যতার জন্যেই এই বিরাট কৃষ্টি-কেন্দ্রকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙকে নালন্দা পরম বন্ধুভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর আগমনবার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুই শত বৌদ্ধ শ্রমণ ও এক সহস্র ছাত্র এক আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করে তাঁকে অতিযত্নে সহরের মধ্যে নিয়ে এলেন। সঙ্গে তাদের বহু মূল্যবান ছত্র ও চন্দ্রাতপ। তারা সাঙের আগমনপথে ছড়িয়ে দিলেন ফুলের রাশি। সুগন্ধি দ্রব্যে বাতাস হয়ে উঠল মন্থর। তারপর তাঁকে তারা এক সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সভাপতির আসনের পাশে একটি সিংহাসন রেখে তাঁকে উপবেশন করবার জন্য অনুরোধ জানান হল। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ উঠে এক ভেরীতে আঘাত করলেন আর সেই সঙ্গে সাঙকে সর্বসমক্ষে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের বিহারে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। তিনি সাঙকে আহ্বান করলেন তাঁদের আবাস স্থল, তৈজসাদি অপরাপর সমস্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য ব্যবহার করবার জন্য।

তারপর সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা ও অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্রের কাছে তাঁকে এনে হাজির করা হল।

সাঙ দেখলেন এক অতি বৃদ্ধ অথচ পরম জ্যোতির্ময় শ্রমণ তাঁর প্রশান্ত, সৌম্য মুখে আনন্দের হাসি হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

সাঙ যখন নালন্দায় যান তখন মহাস্থবির শীলভদ্রের বয়স ছিল একশত ছয় বৎসর। সাঙ তখনই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বৌদ্ধ প্রথানুযায়ী তিনি সেই মহাথেরের সমুখে জানু ও কনুএর উপর ভর দিয়ে, কপাল মাটিতে ছুঁইয়ে, পিছনের পদদ্বয় জোড়া করে দীক্ষিত হলেন। মহাথের শীলভদ্র তাঁকে বহু আশীর্বাদ ও প্রশংসা করলেন। তার পর আসন পরিগ্রহ করতে অনুরোধ জানালেন।

সব শেষে মহাস্থবির সাঙকে প্রশ্ন করলেন—সুদূর চীন থেকে ভারতবর্ষে আসার মূলে তাঁর উদ্দেশ্য কী?—সাঙ জবাব দিলেন, —আমি আপনার পায়ের তলায় বসে বৌদ্ধ দর্শনের বিজ্ঞানবাদ ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে চরম শিক্ষা নেবার জন্যে মহাচীন থেকে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছি। উত্তর শুনে মহাস্থবির কিছুতেই তাঁর অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। তিনি সজল কণ্ঠে সাঙকে বললেন—কিছুদিন পূর্বে এক নিষ্ঠুর ব্যাধির আক্রমণে আমি মরণ কামনা করেছিলাম। কিন্তু রাত্রে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নে আমি তিনটী দেবতাত্মার দর্শন পেলাম। তাঁদের মূর্তি জ্যোতির্ময়, মুখচোখ মহিমামণ্ডিত, পরণে সুন্দর বেশ। এদের প্রথম জনের পোষাক সোনালী, দ্বিতীয় জন পরেছেন উজ্জ্বল নীলবাস, তৃতীয়ের পরিধেয় রৌপ্যাভ। প্রথম জন হলেন বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী, দ্বিতীয় হলেন বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর, আর তৃতীয় বোধিসত্ব মৈত্রেয়। এঁরা তিন জনেই আমাকে মরণ কামনা করতে নিষেধ করলেন এই বলে, যে এই সদ্ধর্মের প্রচার যাতে দেশ দেশান্তরে হয় একমাত্র তারই জন্যে তুমি দেহ ধারণ কর। তোমার এই কার্যকে সফল করে তুলতে অচিরে এক চৈনিকসন্ন্যাসী তোমার কাছে আসবেন। তুমি তার জন্য প্রতীক্ষা কর।

শীলভদ্রের কথা শুনে সাঙের মুখ আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—হে মহাস্থবির, আমাদের এই মিলন যখন সেই মহান আত্মার ইচ্ছায় সংঘটিত তখন আমাকে আপনার পায়ের তলায় স্থান দিন।

এরপর চলল সাঙের শিক্ষা। সেই সর্ব-শাস্ত্র-পারঙ্গম, অতুলনীয় দার্শনিক ও মহান দ্রষ্টার কাছে সাঙ পরম বিনয়াবনত চিত্তে, অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন বিজ্ঞানবাদ ও যোগাচারের শেষ মীমাংসা। আর এদিকে সেই মহামনীষী সুযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করতে লাগলেন সেই পরম ও চরম জ্ঞান—যা একদিন দ্রষ্টা আসঙ্গ ও বসুবন্ধুর দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই জ্ঞান তারপর আয়ত্ত করেছিলেন তাঁদের শিষ্য দিকপাল নৈয়ায়িক দিঙনাগাচার্য। দিঙনাগের শিষ্য ধর্মপাল ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ। এই ধর্মপালের ভিতর দিয়েই বিজ্ঞানবাদ ও যোগশাস্ত্রের মূলসূত্রটি এসে পৌঁছেছিল তার শ্রেষ্ঠশিষ্য শীলভদ্রের মধ্যে। আচার্য শীলভদ্রের কাছ থেকে হিউয়েন সাঙ গ্রহণ করলেন সেই মহান-সূত্রের ধারা।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মহাযান মত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটী বিভিন্ন রূপ নেয়। তাদের প্রথম শাখাতে হল দাক্ষিণাত্যের অমিতজ্ঞানী দার্শনিক নাগার্জুনের—মাধ্যমিক বাদ। আর দ্বিতীয় শাখাতে রইল আর্যদেব, আসঙ্গ ও বসুবন্ধুর যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ।

শীলভদ্র নিজে যদিও ছিলেন যোগাচার আর বিজ্ঞানবাদ মতের ধারক ও বাহক তবুও মাধ্যমিক মতবাদের গূঢ় তত্বটী হিউ-য়েন-সাঙকে প্রকৃষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে তিনি আদবেই কুণ্ঠা করলেন না।

তিনি বললেন—দ্রষ্টা নাগার্জুনের মাধ্যমিক মতবাদকে জানতে হলে সমাধিরাজ-সূত্তে ও ললিতবিস্তরের মহাবৈপুল্য-সূত্তে যে অস্তি-

নাস্তির উল্লেখ আছে তাদের সম্যকরূপে জানতে হয়। সমাধিরাজ-সূত্ত বলছেন—

অস্তীতি নাস্তীতি উভেপি অন্তা। সুদ্ধেতি অসুদ্ধেতি ইমেপি অন্তা॥

তস্মাদুভে অন্তবিবর্জিতা। মধ্যে হি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ॥

আর মহাবৈপুল্য-সূত্তে আছে—

ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তিধর্ম্ম। সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তিভাবাঃ॥
হেতুক্রিয়া পরম্পরা জানেত। তস্য ন ভোতীহ অস্তিনাস্তিভাবাঃ॥

এর অর্থ হল এই যে—অস্তিনাস্তি এই দুই অন্ত। 'আছে' বলে বস্তুর স্থিতির সুরু আর 'নাই' বলে তার স্থিতির শেষ। শুদ্ধি অশুদ্ধিও সেই রকমের দুই অন্ত। সুতরাং যদি কোন গভীর ভাবের উপর মনকে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয় তবে দুই অন্ত ছেড়ে দিয়ে মধ্য স্থানে অবস্থানই কর্তব্য। অস্তিতে যখন কোন কিছুর সবে সুরু হয় তখন ভবপ্রগাঢ়তা বিদ্যমান থাকে না। যখন নাস্তিতে শেষ হয় তখনও সেই একইরকম ভাবের অবিদ্যমানতা। তাই যিনি হেতুক্রিয়া পরম্পরা জানেন তাঁর মনে কখনও অস্তিনাস্তি ভাব আসেনা। অস্তিনাস্তি পরিশূন্য এই মধ্যঅবস্থাকে নাগার্জুন নির্বাণের অবস্থা বলে ধারণা করেছিলেন। তাই তাঁর মতবাদ হল মাধ্যমিক মতবাদ। নাগার্জুনের মতে—অতো ভাবাভাবান্তদ্বয়রহিতত্বাৎ সর্ব্বস্বভাবানুৎপত্তি লক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপৎ মধ্যমো মার্গ ইত্যুচ্চতে। —এরও অর্থ হল ভাব আর অভাব এই দুইয়ের মাঝখানে, থাকা-নাথাকার মধ্যে এই যে শূন্যতা এইই হল নির্বাণের স্বরূপ। শীলভদ্র অসীম উদারতার সঙ্গে হিউয়েন সাঙকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—কিন্তু এই শূন্যতাকে ভুল করলে চলবে না। এ শূন্যতা সত্যিসত্যিই সবকিছুর অনুপস্থিতি নয়। বরঞ্চ বলা যায় এ শূন্যতা থাকা-না থাকা, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ এ সব কিছুর উর্ধে। একে বলা যায় মানস-

ভাবলোকের এক জ্যোতির্ময় তুরীয় অবস্থা যেখানে পার্থিব সবকিছুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব স্তব্ধ। সে হল এক অনির্বাণ আলোকের সীমাহীন স্রোতধারা। মাটীরমানুষের মন সাধারণ অবস্থায় সেখানে পৌছায় না বলেই তাকে তারা বিরাট ভয়াবহ শূন্য রূপে ভেবে নেয়। কিন্তু যার মন সেখানে পৌঁছায় সে জানে যে এই শূন্যতা সব কিছুর অবিদ্যমানতা নয় এ হল পরিশুদ্ধ আনন্দের অসীম সমুদ্র।

তারপর যোগাচার আর বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আচার্য শীলভদ্র হিউয়েন সাঙএর যাবতীয় প্রশ্নের জটীল গ্রন্থিগুলি ছাড়িয়ে বোঝাতে লাগলেন সহজ ও সুন্দর করে।

শীলভদ্র বললেন—দ্রষ্টা আসঙ্গ দেখেছিলেন এই জগতের সব কিছু পদার্থ, সবকিছু ঘটনাই নিত্য পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন-শীলতার মধ্যে একমুহূর্তে যা কারণ বলে মনে হয় পরমুহূর্তে তাইই আবার কার্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার এক মুহূর্তে যে কার্য·পরমুহূর্তে তাই হল কারণ। এভাবে কার্য-কারণসূত্র পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এর শেষ কোথাও নাই। আর এই কারণ থেকে কার্য বা কার্য থেকে কারণে যাতায়াতের মূলকথাটাই হল সংস্কার থেকে রূপের উৎপত্তি আবার রূপ থেকে সংস্কারের।

কিন্তু আসঙ্গ ও বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদ যা বললেন—তার আসলকথা হল আলয়-বিজ্ঞান রহস্য। পৃথিবীর যা কিছু দৃশ্য, অদৃশ্য বস্তু সব কিছুই হল ক্ষণিকের। প্রত্যেক কার্যই কালের অধিগত। কালেই তাদের সৃষ্টি কালেই তাদের ধ্বংস। আবার প্রত্যেকটী খণ্ড কালকে বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে মহাকালের অনন্ত স্রোত। এই স্রোতের মধ্যে বুদ্বুদের মতো সবকিছু পদার্থ মুহূর্তে সৃষ্ট হচ্ছে আবার মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নদীর স্রোতের মতো এই আলয় বিজ্ঞানের গতি ও কালস্রোতের সঙ্গে এক ভাবে চলেছে। এর কোথাও ছেদ নাই, বাধা নাই, বিরাম নাই। এই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি আর ধ্বংস, ধ্বংস

আর সৃষ্টি এই হল আলয় বিজ্ঞানের আসল রূপ। এর থেকে যা ফেনার মতো উদ্ভূত হচ্ছে তা হল জীবের অসীম ক্লেশ, অপার দুঃখ সাগর মন্থন করা গরল।

সুতরাং—বললেন শীলভদ্র, আসঙ্গ আর বসুবন্ধু ভেবেছিলেন কেমন করে এই অনন্ত আলয়-বিজ্ঞান স্রোতের কবল থেকে জীবকে মুক্ত করা যায়। তথাগতের জিজ্ঞাসাও ছিল এই একই। কেমন করে জীবকে এই অনন্ত ক্লেশের হাত থেকে রেহাই দেওয়া যায়। সুগভীর সূক্ষ্ম চিন্তায় তার সদুত্তরও পেয়েছিলেন সেই দুই মহামনীষী। তাঁরা দেখেছিলেন আত্মাকে এই কালস্রোত থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই যোগাচার সাধন। এই সাধনায় জ্ঞান তীক্ষ্ণধার ছুরীর মতো রূপ নেয়। জ্ঞান থেকে আসে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা থেকে আসে বোধি। এই বোধি দিয়ে জগতের বস্তু-পিণ্ডকে, মনকে, ঘটনা স্তূপকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে বিশ্লেষণ করে কেটে ফেলা যায়। কাটতে কাটতে এসে শেষ পর্যন্ত পৌঁছান যায় সকল পদার্থ, মন এবং ঘটনার অণুতে। এই অবস্থায় আত্মা দেখতে পায় কোথায় তার সঙ্গে এই অণুর সূক্ষ্ম সংযোগ কোন সূত্রে সে বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর সেই অতি তীক্ষ্ণ এবং অতি সূক্ষ্ম বোধি-ছুরিকাতেই সেই অণু-পরমাণুর বন্ধন, অহমিকার বন্ধন, মায়া-মোহের বন্ধনটুকু কেটে ফেলে মনকে তুলে নেওয়া যায় অসীম আকাশে। এই আকাশই হল মুক্ত আনন্দের, চির-নির্বাণের আলোয় ভরা আকাশ।

মহাজ্ঞানী শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধদর্শনের মূল কথাটুকু সহজ সরল ভাষায় সাঙ শুনলেন। শুধু শুনলেন না—উপলব্ধি করলেন। মানস-লোকে তাকে চর্যা করতে লাগলেন নালন্দায় বসে। তাঁর মনে এবারে সত্যি সত্যিই আগুনের পরশমণি ছুঁয়ে গেল। যে দ্বিধা, যে প্রশ্ন নিয়ে তিনি সুদূর চীনদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন —তারা দূর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি দার্শনিক থেকে হয়ে

উঠলেন পরম দ্রষ্টা। তাঁর মানস নয়নের সমুখে নির্বাণের জ্যোতির্ময় পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল।

সাঙের জ্ঞান শেষ পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে একটা বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে গিয়ে পড়ল। এই নালন্দাতে তিনি ভিক্ষু প্রজ্ঞাভদ্রের কাছে বসে জানলেন শ্রাবকযানের সর্বাস্তিবাদীন মতবাদকে। আর মাধ্যমিক মতবাদের আনুপূর্বিক সমস্ত কুটস্থ তথ্যের বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করলেন ভিক্ষু স্থিরমতি ও যষ্ঠিবানগিরিতে জয়সেনার কাছে।

এই ব্যাপক জ্ঞান তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত রকম মলিনতা দূর করে তাঁকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির নির্মল ও পরিশুদ্ধ অবস্থায় উন্নীত করে দিয়েছিল।

একদিন এই নালন্দায় বাস করার সময়ে তাঁর সঙ্গে মাধ্যমিক বাদের উপাসক সন্ন্যাসী ভিক্ষু সিংহরশ্মির বিতর্ক উপস্থিত হল।

সিংহরশ্মি সদম্ভে বলেছিলেন—নাগার্জুনের মাধ্যমিক বাদের কাছে আসঙ্গ ও বসুবন্ধুর যোগাচার আর বিজ্ঞানবাদ নিতান্ত অর্বাচীন। সাঙ সে কথার উত্তরে দৃঢ় স্বরে বললেন—এই সব পরমজ্ঞানী চিন্তা-নায়করা যখনই কোন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন তখনই এক একটী নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। তাবলে তাঁরা কখনই একে অপরের মতবাদকে তুচ্ছ বলে মনে করেননি বা হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি। আমাদের কাজ হল এই সব মহামনীষীদের মতবাদের ভিতর থেকে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় খুঁজে বার করা। যদি আমরা তা না করে কেবল একে অপরের থেকে কতটা পৃথক এই দেখাতে চেষ্টা করি—তবে দোষ হবে সম্পূর্ণ আমাদেরই। কারণ আমরাই এই সব মতবাদের টীকা-ভাষ্য করবার মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে রত রয়েছি। আর যে সব টীকা-ভাষ্য ধর্মে বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়ে কেবল সেখানে পাণ্ডিত্যের অহংকার, বিতর্ক আর সংশয় উপস্থিত করে সে সব টীকা-ভাষ্য অসার বলে ফেলে দেওয়া উচিত।

নালন্দাতে অবস্থানকালে সাঙ তখনকার দিনে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুটী বিশেষ বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এই দুটী হল কনাদের বৈশেষিক ও কপিলের সাঙ্খ্য-দর্শন।

এই নালন্দাতে বসেই সাঙ জৈনদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—এই সব জৈনরা দিবারাত্র অতি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন করে থাকে। এদের ধর্মগুরু মহাবীর যে ধর্মপ্রচার করে গেছেন তার বেশীর ভাগই হল বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ থেকে অপহৃত। এরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতোই আচরণ করে। সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত করে একটু শিখা রাখে আর দিগম্বর হয়ে থাকে। যারা কাপড় পরে তারা শ্বেতাম্বরে দেহ ঢাকে। তাদের ধর্মগুরুর মূর্তিটী পর্যন্ত দেখতে অবিকল বুদ্ধের মতো।

হিন্দু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—গায়ে ছাইভস্ম মাখাকে এরা একটা বিশেষ কৃতিত্বের কাজ বলে মনে করে। কেউ কেউ নরকরোটীর মালা গলায় পরে ভীষণদর্শন শবাহারী যক্ষের মতো গুহায় বাস করে। কেউ বা পচা নর্দমার পাঁকে পড়ে থাকা শুয়োরের মতো সারা দেহে কাপড়ে কাদা মাখিয়ে রাখে। পচা মাংস খায়। এ সব সত্ত্বেও হিন্দুরা এই সব কাজকে ধর্মাচরণ বলে মনে করে। এর থেকে বোকামী আর জগতে কী থাকতে পারে?

হিন্দুদের এই অদ্ভুত আচরণ কনফুসিয়াসের সৌন্দর্য-শীলতা-বোধে পরিপুষ্ট ও বৌদ্ধ যোগাচারে শিক্ষিত সাঙের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল।

পরবর্তী যুগে হিউয়েন সাঙ সিদ্ধি নামে যে সুবৃহৎ দর্শনের গ্রন্থটি রচনা করেন তার মতবাদগুলির প্রায় সবই ছিল ভারতীয় 'সুম্মা' গ্রন্থেরই অনুরূপ। বৌদ্ধ দার্শনিক ও দ্রষ্টাদের দ্বারা যে ভাব-শৈলরচিত হয়েছিল তার সুমেরু ছিল এই 'সুম্মা' গ্রন্থ।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দের সারা বর্ষাকালটাই সাঙের কেটে গেল নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে। সাঙ লিখেছেন—প্রত্যক দিন তিনি পেতেন উপযুক্ত পরিমাণ মাখন, দুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। রাজার আদেশে প্রতিদিন একজন শ্রমণ ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বার হতেন ভ্রমণে—কখনও রথে, কখনও অশ্বে, আবার কখন বা শিবিকায়।

নালন্দায় অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চার মধ্যে একবার তিনি একটু সময় করে নিয়ে দেখে এলেন রাজগৃহে। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহ—বর্তমান নালন্দার কিছু দূরেই অবস্থিত। রাজগৃহ মহাভারতের যুগে ছিল পরাক্রান্ত জরাসন্ধের রাজধানী। পরে এইখানেই রাজত্ব করেন মহারাজ বিম্বিসার। রাজগৃহের প্রতি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভগবান তথাগতের চরণস্পর্শে পবিত্র।

সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করে এক সময়ে সিদ্ধার্থ এসে পড়লেন রাজগৃহে। রাজগৃহ তখন মহারাজ বিম্বিসারের রাজধানী। বিম্বিসার রাজা শুদ্ধোদনের বন্ধু। সিদ্ধার্থ নিজেকে অতি গোপনে রেখে সহরে গেলেন ভিক্ষার জন্য। কিন্তু সেই দেবদুর্লভ মূর্তিকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে সহরের পথে বিষম বিস্ময় আর কোলাহল উপস্থিত। শেষে যে ভয় তিনি করেছিলেন তা ঘটল। মহারাজ বিম্বিসার লোক পরম্পরায় খবর পেলেন তাঁর আগমনের।

রাজা বিম্বিসার নিজে গেলেন সেই ভিক্ষু সন্দর্শনে। অনুপমকান্তি ভিক্ষুকে দেখে রাজা বললেন—আপনি নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত বংশজাত। আপনার সম্যক পরিচয় আমাকে দিন। আপনাকে আমি রাজৈশ্বর্য সমস্ত কিছু সেবার জন্য দান করব। আমার মনে হয় আপনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ।

ভবহি মম সহায়ু সর্ব্বরাজ্যং।
অহু তব দাস্যে প্রভূত ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥
মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে মাতুশ্চ তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসম্।
পরম সুকুমারু তুভ্যকায়ঃ ইহ মম রাজ্যে বসাহি ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥
হে তাপস তব সুকুমার তনু অতি লাবণ্যময়।
বড় এ কঠোর সন্ন্যাসী ব্রত তোমার যোগ্য নয়।
নির্জন বনে করিও না বাস ভূমি আর তৃণাসনে
এসো বসো মোর রাজপ্রাসাদের রত্নসিংহাসনে।
মোর এ রাজ্য, ভোগৈশ্বর্য ঢালি দিব তব পায়
উপভোগ কর কাম্য বস্তু যাহা তব মন চায়।

সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন—

স্বস্তি ধরণিপাল তেস্তু নিত্যং ন চ অহং কামগুণেভিরর্থীং কোস্মি।
কামং বিষসমা অনন্ত-দোষা নরকে প্রপাতন প্রেততির্যকযোণি।
বিহুভির্ব্বিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ জহিত ময়া যশ্চ পক্কখেট পিণ্ডং॥

... ...

অপিচ ধরণীপাল পশ্যকায়ং অধ্রুব সংসারকু দুঃখযন্ত্রমেতৎ।
নবভিব্র্ণমুখৈঃ সদা শ্রবন্তং ন মম নরাধিপ কাম ছন্দরাগঃ॥
অহমপি বিপুলান বিজহ্য কামান্ তথাপিচ ইস্ত্রি সহস্রান দর্শনীয়ান।
অনভিরণ ভবেযু নির্গতোহ্যহং পরমশিবা বরবোধি প্রাপ্তুকাম॥
হে রাজা তোমার মঙ্গল হোক, শোন গো তোমারে কহি
তোমার দ্বারেতে আসি নাই আমি কোন আকাঙ্ক্ষা বহি।
কামনা জগতে বিষের মতন অনন্ত দোষ কামে
কামনাব ফেরে নিত্য আত্মা ঘোর রৌরবে নামে।
এই কামনারে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে জ্ঞানী যত
তাই আমি তারে ফেলিয়াছি দূরে পচা পিণ্ডের মতো॥

... ...

অনিত্য এই সংসার দেখ দুঃখযন্ত্র প্রায়
নব ব্রণ মুখ হইতে সদাই স্রাব ঝরে বেদনায়
এ সব দেখিয়া হে ধরণীপাল কোন সচেতন নর
কামে আসক্ত হবে পুনরায় বেঁধে বাসনার ঘর।
ছাড়িয়া এসেছি সহস্র নারী বিপুল রাজ্যধন
পরমানন্দ কল্যাণময় বোধি লাভে শুধু মন।

সন্ন্যাসীর বাণী মহারাজ বিম্বিসারের মনে যেন তপ্ত লৌহফলকে লেখা হয়ে গেল। বিম্বিসার নিজেও কামজ্বরে জর্জরিত। কিন্তু ত্যাগ করারও তো তাঁর উপায় নাই। আত্মসচেতন সম্রাট মনে মনে বুঝলেন—তপস্বীর মনের দৃঢ়তা কতদূর। তিনি সিদ্ধার্থকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য আর দ্বিতীয় কথাটী পর্যন্ত বললেন না। শুধু মনে মনে হাজার সাধুবাদ সিদ্ধার্থের উদ্দেশে ধ্বনিত হতে লাগল। সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ছেড়ে এগিয়ে চললেন।

পরে বুদ্ধত্বলাভ করে যখন বুদ্ধ মৃগদাবে প্রথম ধর্মচক্র আবর্তিত করলেন—সে খবর সর্বপ্রথম এসে পৌঁছাল মহারাজ বিম্বিসারের কাছে। তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠালেন ভগবান বুদ্ধকে মগধে আসবার জন্য। সেই সময়ে এই রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে সপারিষদ বিম্বিসার গিয়েছিলেন বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করার জন্য। তারপর পরম বিনয়াবনত চিত্তে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই সদ্ধর্মে।

গৃধকূট পবিত্রহয়ে আছে বুদ্ধের ভক্ত শিষ্য আনন্দের সাধন স্থান হিসাবেও।

এইসব পুণ্যস্থানগুলি ভ্রমণ করে সাঙ আবার ফিরে এলেন নালন্দায়।

এই নালন্দায় একাদিক্রমে তিনি কাটালেন পনেরো মাস। এই সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রই নয়—তিনি শীলভদ্রের কাছে

অধ্যয়ন করলেন যাবতীয় শাস্ত্রাদি। এইভাবে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেও লাভ করলেন বিশেষ বুৎপত্তি।

তারপর একদিন নালন্দার সেই পরম শান্তিময় কোল ছেড়ে আবার বার হয়ে এলেন পথে—আবার হাতে নিলেন পরিব্রাজকের দণ্ড।

নালন্দা থেকে তিনি এলেন পশ্চিম বাংলায়। এখানে তিনি কাটালেন ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের সমস্ত গ্রীষ্মকালটা। তিনি লিখলেন—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এই বাংলা, এখানে আছে প্রচুর বন জংগল তাতে পাওয়া যায় বহুরকমের জীবজন্তু। এর জংগলে বুনো হাতী আর গণ্ডার চরে বেড়ায়। এখানকার রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে রণহস্তীর সংখ্যা খুবই বেশী। কিছুদিন পরে গঙ্গা নদী পার হয়ে সাঙ চলে গেলেন উত্তরবঙ্গে। সেখানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আর মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ দেখে—তিনি এসে পৌঁছালেন গঙ্গা নদীর বদ্বীপ সমতটে। সমতট সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—এদেশ অতি নীচু আর স্যাঁতসেতে। প্রচুর জলা-জায়গা থাকায় শস্য জন্মায় প্রচুর। এখানে ফল ফুলের পরিমাণ অসাধারণ। অধিবাসীদের গায়ের রং কালো, আকৃতি খর্ব ও প্রকৃতি কিছুটা নিষ্ঠুর।

ক্রমে তিনি নেমে গেলেন বঙ্গোপসাগরের দিকে—এসে হাজির হলেন তখনকার দিনের ধনাঢ্য বন্দর তাম্রলিপ্তিতে—বর্তমান তমলুক সহরে। এখানে বসে তিনি স্থির করলেন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে সিংহলে যাবার। সিংহল তখন ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একটী বিরাট কেন্দ্র।

ষোল

হিউয়েন সাঙ ভাবলেন একরকম আর পথের দেবতা তাঁর চলার পথ রচনা করলেন আর একভাবে।

তাম্রলিপ্ত বন্দরে আছে বহু বাঙালীর পোত আর আছে মালয় নাবিকদের অদ্ভুত ধরণের নৌকাগুলি। সাঙ সেই সব নাবিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন সিংহলে যাবার জন্য। জনৈক বাঙালী নাবিক তাঁকে পরামর্শ দিল বঙ্গোপসাগরের পূর্বতীর দিয়ে সোজা দক্ষিণ দেশের দিকে এগিয়ে যাবার। সেখানে আছে কর্ণাট রাজ্য—সেটা হল ভারতবর্ষের দক্ষিণে শেষ সীমানা। সেখান থেকে সিংহল সমুদ্র পথে মাত্র তিন দিনের পথ। নতুবা এই বঙ্গোপসাগরের তীব্র ঢেউয়ের আঘাতের ভিতর দিয়ে যাওয়া সমুদ্রপথে যাতায়াতে অনভ্যস্ত সাঙের পক্ষে হয়তো বিপজ্জনক হতে পারে। নাবিকটীর পরামর্শ সাঙের মনঃপুত হল। তিনি তার কয়েকদিন পরেই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে যাত্রা শুরু করে দিলেন পদব্রজে।

মেদিনীপুর জেলা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল বাংলার সীমানা। সাঙ এসে পড়লেন ওড্র দেশে—এখনকার উড়িষ্যাতে। বাতাসে উত্তাপ বাড়তে লাগল, চোখে পড়তে লাগল অজস্র বনানীর শ্যাম সমারোহ। উড়িষ্যায় ও কলিঙ্গে তিনি দেখলেন বহুসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির। সাঙ তাদের যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় পুরী, ভুবনেশ্বর বা কোণারকের মন্দিরের কোন কোনটা হয়তো তখন তৈরী হয়েছিল।

এর পর তিনি এসে পৌঁছালেন মহাকোশলে। মহাকোশল ছেড়ে গোদাবরী নদী পার হয়ে তিনি এলেন প্রাচীন অন্ধ্রদেশে। তখনকার দিনে অন্ধ্র ছিল কৃষ্ণা আর গোদাবরীর মাঝখানের ভূভাগ। এ রাজত্ব

তখন ছিল চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনে। অন্ধ্রকে পিছনে ফেলে তিনি চলতে লাগলেন আরও দক্ষিণে। এলেন অমরাবতীতে। অমরাবতী ছাড়িয়ে সাঙ এসে পৌছলেন কর্ণাট রাজ্যে।

তখন কর্ণাট ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ পল্লব-রাজাদের রাজ্য। এ রাজ্যের খ্যাতি ছিল খাঁটি হিন্দু স্থাপত্য ও শিল্প-কলার ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যে গরিয়সী। কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চীপুর বা আজকের কাঞ্চী-ভরমের দেউল আর তাদের গায়ে উৎকীর্ণ শিল্প-ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শনগুলি আজও ভারতের গৌরবের বস্তু হয়ে আছে। আর দক্ষিণী স্থাপত্যে কলাচাতুর্যের কথা উঠলে মহাবলীপুরমের কথা তো বলতে হয় সবার আগে। এই মহাবলীপুর সেদিন ছিল কর্ণাটের বন্দর।

পল্লবরা ছিল চালুক্য রাজাদের জন্মশত্রু। দুই রাজ্যই ছিল বেশ বড় আর তাদের দুই রাজাই ছিল মহাপরাক্রমশালী। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মন রাজত্ব করেন ৬২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁরই রাজত্বকালের মধ্যে সাঙ কর্ণাটে আসেন। হর্ষজিৎ, বীর যোদ্ধা, মহারাষ্ট্ররাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ৬৪২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে এই নরসিংহ বর্মনের হাতেই মারা পড়েন। আর চালুক্য রাজ্য এসে পড়ে পল্লবদের হাতে। এই পল্লবদের উৎসাহ আর পৃষ্ঠপোষকতাতেই দক্ষিণ ভারতের বেশীর ভাগ হিন্দু-কৃষ্টি ও শিল্প-কলার কেন্দ্রগুলির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সাঙ এই পল্লবদের রাজত্বে বেশ কিছুদিন বাস করলেন। এরপর তিনি স্থির করলেন মহাবলীপুরমের বন্দর থেকে নৌকা নিয়ে সিংহলে পাড়ি দেবার।

এবারও বাধা এল অন্যরূপে। যাত্রা সুরু করার ঠিক আগেই সাঙ শুনতে পেলেন সিংহল থেকে কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণ এসেছেন সহরে। সাঙ গেলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। শ্রমণরা সাঙকে সিংহলে যেতে বিশেষ করে নিষেধ করলেন। সিংহলে তখন চলছিল

দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর দুর্ভিক্ষ—যার জন্য এই সাধু শ্রমনদের তখন পালিয়ে আসতে হয়েছিল ঘর বাড়ী ছেড়ে। অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা সাঙের নিজেরও কম নয়। তিনি সিংহলে যাবার অভিপ্রায় ত্যাগ করলেন ও যাত্রাপথ ফিরিয়ে নিয়ে পা চালালেন মহারাষ্ট্রের দিকে।

চালুক্য বা মহারাষ্ট্র রাজ্য তখনকার দিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। মহারাষ্ট্র জাত হল রাজপুতদের থেকে উদ্ভূত একটা শাখা। সম্ভবতঃ ছয় শতকের শেষের দিকে মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থান হয়। মহারাষ্ট্র বা মারাঠা জাত চিরদিন ভারতের ইতিহাসে সামরিক জাত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এদের এই জাতিগত ঐতিহ্য দ্বিতীয় পুলকেশী থেকে সুরু করে শিবাজী পর্যন্ত কোথাও ব্যাহত হয়নি।

হিউয়েন সাঙ যখন মহারাষ্ট্রে আসেন তখন মহারাষ্ট্রের গৌরবসূর্য একেবারে মধ্য গগনে। আবার সাঙেরই ভ্রমণকালের মধ্যে সেই গৌরব-সূর্যকে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তেও দেখলেন তিনি।

সাঙ যখন মারাঠা দেশে আসেন তখন তার সম্রাট ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ও বিজেতা দ্বিতীয় পুলকেশী। তাঁর রাজ্য তখন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের প্রায় সবটা।

এই মহারাষ্ট্র জাত সম্বন্ধে সাঙ লিখলেন—মারাঠাদের আকৃতি দীর্ঘ। সকল কাজকর্মে এরা অতিশয় পটু। এরা আত্মসম্মান আর কর্তব্য জ্ঞানকে সবার ওপর স্থান দেয়। তাদের সঙ্গে কেউ যদি সহৃদয় আচরণ করে তবে তারা তা সহজে ভোলে না। কিন্তু তাদের যদি কেউ কোন ক্ষতি করে বা আত্মসম্মানে আঘাত দেয় তবে সে লোকের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এরা শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড—কিন্তু আশ্রিতের প্রতি অত্যন্ত সদাশয়।

দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬০৮ খৃষ্টাব্দে। আর

তাঁর জীবনের অবসান হয় পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মনের হাতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বীরত্ব হল সমগ্র উত্তরাপথ বিজয়ী হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণ রোধ করা ও তাঁকে যুদ্ধে কয়েকবার পরাস্ত করা।

পুলকেশী যদিও হর্ষের শত্রু ছিলেন, তবুও হর্ষের বন্ধু হিউয়েন সাঙ তাঁর চরিত্র বর্ণনায় বেশ উদারতাই দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—সম্রাট পুলকেশী ছিলেন একজন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ও প্রকৃত বীর। তিনি যে সৈন্যদল তৈয়ার করেছিলেন— তাদের একজনের বীরত্বের কাছে শত্রুপক্ষের দশ সহস্র লোক হটে যেতে পারত। এইরকম এক সৈন্যদল থাকার জন্যই ভারতের অন্য রাজা অপেক্ষা পুলকেশীর প্রতাপ ছিল এত বেশী। এরই জন্য আর্যাবর্তের অধিকাংশ ভূখণ্ড বিজেতা সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের তরবারি বোধ হয় মহারাষ্ট্র সম্রাজ্যের ওপর কোন আঘাত রেখে যেতে পারেনি।

সাঙ সম্ভবত ৬৪১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালটা পুলকেশীর রাজধানী নাসিকেই কাটিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন—এখানকার অধিবাসীদের পাঠানুরাগ একটা প্রশংসার বিষয়। চালুক্য রাজারা হলেন হিন্দু কিন্তু পুলকেশীর রাজ্যে হিন্দু আর বৌদ্ধ এই দুই ধর্মই অতি নিরুপদ্রবে পাশাপাশি রয়েছে। হিন্দু মন্দিরের পাশেই বৌদ্ধ-বিহার এমন উদাহরণ মহারাষ্ট্রে অল্প নয়।

মহারাষ্ট্রে কিছুকাল কাটিয়ে সাঙ এলেন মালবে। মালবের উজ্জয়িনী ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী—মহাকবি কালিদাসের দেশ। সেখানে শিপ্রা নদী তীরে মহাকালের মন্দির দর্শন করে হিউয়েন সাঙ এলেন তারই ঠিক পাশের রাজ্য বল্লভীতে।

এই বল্লভীই হল বর্তমান গুজরাট। গুজরাটের বাণিজ্য ব্যাপার ছিল তখন জগৎ বিখ্যাত। তখনকার দিনে গুজরাটের বণিকরা দেশ

দেশান্তরে যাতায়াত করত বাণিজ্যের জন্যে। সাঙ বল্লভীতে বসে পারস্য দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন। যদিও সমুদ্র পার হয়ে তার ইরাণ কী তেহরাণে যাওয়া হল না, তবুও তিনি পারস্য জাতি ও তাদের সভ্যতা সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা সযত্নে লিখে রাখলেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর পাতায়।

অতঃপর বল্লভী ত্যাগ করে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে চলতে চলতে তিনি এসে পড়লেন একেবারে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। তারপর সিন্ধু ও মুলতান সহর দেখে তিনি পুনরায় তাঁর যাত্রাপথের মোড় ফেরালেন মগধের দিকে।

* * *

সতের

নালন্দাকে সাঙ ভুলতে পারেননি। নালন্দা হল সাঙের দ্বিতীয় জন্মভূমি। তার মাটীর উপর ছিল সাঙের অগাধ মমতা, অসীম ভালবাসা। তাই তাঁকে আবার সুদূর মুলতান থেকে ফিরে আসতে হল নালন্দায়।

নালন্দা এবং তার আশ-পাশের বৌদ্ধ তীর্থগুলি তাঁর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এবার তিনি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে। সাঙ যে শুধু অধ্যয়নের দ্বারা একজন শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতই হয়েছিলেন তা নয়—তার ধ্যাননেত্রে ফুটে উঠেছিল সত্যদ্রষ্টার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি। তাই তিনি নালন্দায় বসে কয়েকটী স্বপ্নের মধ্যে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কি হবে।

একদিন তিনি নালন্দার মহাবিহারে নিদ্রার মধ্যে দেখলেন যেন সমস্ত নালন্দা জনশূন্য। কক্ষে দীপ জ্বলে না। ছাত্রদের অধ্যয়ন-গুঞ্জন নিশ্চুপ। শ্রমণদের গম্ভীর কণ্ঠে বুদ্ধং শরণং গীত নীরব। সাঙ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন এ কোন প্রেতপুরী? সাঙ দেখছেন আর বিস্মিত হচ্ছেন। এর সব কিছুই নালন্দা মহাবিহারের বলে মনে হচ্ছে—এর প্রাসাদ, এর প্রকোষ্ঠ এর উদ্যান সমস্তই। কিন্তু এ নালন্দা যে একেবারেই প্রাণশূন্য একান্ত অন্ধকার নির্জন। সাঙের অন্তর এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেখলেন সেখানে অসংখ্য মহিষ বদ্ধঅবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রাঙ্গণে একসময়ে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুলের গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে উঠত—সেখানে এক দূষিত আবর্জনার দুর্গন্ধ। সাঙ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন প্রাসাদের

মধ্যে। কিন্তু দেখলেন সবই জনশূন্য। ছাত্র, অধ্যাপক কি শ্রমণ, কাউকে দেখা যায় না। চারতলায় উঠে সাক্ষাৎ পেলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষের। তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিব্য-জ্যোতি। মুখাবয়ব অত্যন্ত দৃঢ় ও সুগম্ভীর। সাঙকে তিনি কোন কথা না বলে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন দিগ্বলয়ের দিকে। সাঙ দেখলেন দূরে যেন কোথায় ভীষণ আগুন লেগেছে আর তার লেলিহান শিখায় সমস্ত গ্রাম, নগর, জনপদ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তী সম্রাট হর্ষের মৃত্যু আসন্ন। আর ঐ আগুন হল হর্ষের মৃত্যুর পর দেশে যে বিপ্লব আসবে তারই আগুন।

আর একদিন সাঙ্ সবে ফিরেছেন বুদ্ধগয়া থেকে তীর্থযাত্রা সেরে। রাত্রে নিদ্রার মধ্যে দেখলেন বুদ্ধগয়ার স্তূপ ভেদ করে এক সুতীব্র আলোক-রশ্মি নৈশ আকাশকে দ্বিপ্রহরের মতো আলোকিত করে দিল। চন্দ্র, তারা আর কিছুই চোখে পড়ে না। একটা সুগন্ধে দশদিক ভরে উঠল। কয়েক মুহূর্ত সে রশ্মি আলো দিয়ে আবার ধীরে ধীরে নির্বাপিত হতে লাগল। আবার পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেল। কেবল অনন্ত আকাশে নির্বাক সাক্ষীর মতো চেয়ে রইল অসংখ্য নক্ষত্রের দল। নানাভাবে দ্রষ্টা সাঙ বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আয়ু আর বেশী দিন নয়।

তারপর অকস্মাৎ নালন্দার নির্বিঘ্ন, সৌম্য জীবনের মধ্যে সাঙ শুনতে পেলেন আবার পথের দেবতার ডাক। পর্যটক তিনি—ঐ আহ্বান উপেক্ষা করেন এমন সাধ্য তাঁর নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন এইবার ফিরতে হবে মহাচীনে।

তিনি তাঁর অন্তরের ইচ্ছা নালন্দার শ্রমণদের কাছে ব্যক্ত করে ফেললেন। তাঁরা অতি বিস্মিত হয়ে সাঙকে বললেন—হে স্থবির,

যখন আপনি বুদ্ধের জন্মভূমি এই ভারতে একবার পদার্পণ করে নিজের আত্মাকে পবিত্র করেছেন তখন আবার চীনে ফিরে যাবার ইচ্ছা আপনার কেন? আর কেনই বা আপনার এই অতি সুখকর সঙ্গ আমাদের দুদিনের জন্য দান করে আবার তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন? চীন হল বর্বরের দেশ। সেখানে ফিরে কোন ইষ্ট সিদ্ধিই বা আপনার হবে? তার চাইতে এই নালন্দায় জ্ঞানের চর্চা করে আর বুদ্ধের অপার মহিমা কীর্তন করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিন। এর চেয়ে শ্রেয় ও প্রেয় কোন জিনিষই কোন শ্রমণের থাকতে পারে না।

সাঙের স্বদেশ-প্রীতি ছিল প্রবল। তিনি দম্ভভরে উত্তর দিলেন—ভগবান বুদ্ধ চেয়েছিলেন তাঁর বাণী দেশে দেশান্তরে, পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ুক। যে ব্যক্তি নিজেই সেই সদ্ধর্মের উপসত্ব ভোগ করতে বাসনা করে আর পরকে তা থেকে বঞ্চিত করে সে হল নরাধম। আমার কাছে তার জীবনের কোন মূল্যই নাই। শেষে বলেন—সূর্য প্রভাতে পূর্বাকাশে উদিত হয় ও সারা দিন পৃথিবী পরিক্রমণ করে—কেন জানেন? তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হল জগতের অন্ধকার নাশ করা। আমাকে মহাচীনে ফিরতে হবে ঐ একই উদ্দেশ্যে।

আঠার

হিন্দুস্থান দেখা শেষ হল আর হিউয়েন সাঙ পথে বার হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এপথ ভারতবর্ষ হতে মহাচীনে ফিরে যাবার পথ। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও মন কেঁদে উঠল মাতৃভূমির জন্য। সাঙ বিশেষ ব্যস্ত হয়ে যাত্রার আয়োজন শুরু করলেন।

এমন সময়ে ঘটল বিঘ্ন।

ভারতের সুদূর পূর্বে আসাম বা আহোম রাজ্য। তার রাজা ভাস্করকুমার—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বদান্যতায় ছিলেন বিখ্যাত। তিনি নিজে ছিলেন হিন্দু—কিন্তু সাঙের মতো একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করবার আকাঙ্ক্ষা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না।

তিনি দূত পাঠালেন নালন্দায় সাঙকে আমন্ত্রণ করে। সাঙ সে আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না।

আসাম দেখে হিউয়েন-সাঙ অতদিন আগে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর পাতায় যা লিখেছিলেন—আজও তা সত্য হয়ে আছে। "এদেশ ব্রহ্মপুত্র নদের নানা শাখা দিয়ে বেষ্টিত। এখানে গ্রামে, সহরে প্রচুর জলাশয়—পুকুর, নদী, নালা আর হ্রদ। সহরের বাইরে যেদিকে চাওয়া যায় চোখে পড়ে কেবল ধানক্ষেত আর অগুন্তি নারকেল গাছ। জমি সাধারণতঃ ভারী স্যাঁতসেতে আর নীচু। এখানকার লোকেরা বেঁটে আর তাদের গায়ের রং কালো। এদের স্বভাব ভারী নিষ্ঠুর আর বর্বর। এরা দেব-দেবীর উপাসনা করে—বুদ্ধের মত ও পথ এখানে কেউ বিশ্বাস করে না। সেজন্য আসামের কোন জায়গায় কোন বৌদ্ধ-বিহার তৈয়ারী করা হয়নি।

আসামের রাজা ভাস্করবর্মা। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-বংশীয়। এঁর পাঠানুরাগ বিশ্ব-বিখ্যাত। জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা এঁর

রাজ্যে বেড়াতে আসেন। রাজা নিজে বৌদ্ধ নন—তবুও তাঁর বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর শ্রদ্ধা প্রগাঢ়।"—লিখলেন হিউয়েন-সাঙ।

হিউয়েন-সাঙ আসাম ছেড়ে আরও পূবে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলেন ভারত আর চীন দেশের সীমান্তে। সেখানে তিনি খোঁজ করে জানলেন—মহাচীনের এলাকা এখান থেকে মাত্র দু' মাসের পথ। হয়তো তিনি এই পথ দিয়েই দেশে ফিরতেন—কিন্তু খবর পেলেন এ পথ অতিশয় দুর্গম। এই অরণ্যসঙ্কুল পথে যে-সব হিংস্র শ্বাপদরা ঘুরে বেড়ায় তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেও বুনো-হাতীর পালের হাত এড়ান মোটেই সহজ নয়। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। চীনের এলাকার এত কাছে এসে তিনি বুনো-জানোয়ারের ভয়ে সে পথ ছেড়ে দেবেন—তাঁর মন আগুপিছু করতে লাগল।

এমন সময়ে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের এক নিমন্ত্রণ-লিপি তাঁর সব সমস্যার সমাধান করে দিল।

প্রথমবার যখন সাঙ কনৌজে গিয়েছিলেন—তখন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন কনৌজে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি রাজধানীতে ফিরেই দূত পাঠালেন আসামে সাঙকে কনৌজে আনবার জন্য। আসামের রাজা ছিলেন হর্ষের বিশেষ বন্ধু। তিনি স্বয়ং সাঙকে নিয়ে চললেন সঙ্গে করে। গঙ্গা নদীর উপর ভাসল ত্রিশ হাজার নৌকা আর তার তীরে তীরে চলল বিশ হাজার হাতী।

এদিকে হর্ষও প্রত্যুদ্গমন করে এসেছেন—সেই বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য।

কাজুগিরে দু' দলে সাক্ষাৎ হল।

হর্ষ সেখানে শিবির স্থাপন করে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

যখন আসামরাজের বাহিনী সাঙকে নিয়ে সেখানে পৌছাল তখন

সবেমাত্র সন্ধ্যা। কিন্তু হর্ষের অন্তর সাঙকে দেখবার জন্য এতো উন্মুখ যে তিনি পরদিন পর্যন্ত আর অপেক্ষাও করলেন না। তাঁর দূত এসে বলে গেল—মহারাজ হর্ষ রাতে আসবেন জগদ্‌বিখ্যাত ধর্মগুরুর পদ-বন্দনা করতে।

গভীর রাতে গঙ্গার বুকে জ্বলে উঠল হাজার হাজার মশালের আলো। যেন অন্ধকার আকাশে অগুন্‌তি তারার মালা। আর নৈশ-অন্ধকার চুরমার করে ভেঙ্গে দিয়ে বেজে উঠল হাজার তুরী।

সমগ্র আর্যাবর্তের শেষ একচ্ছত্র সম্রাট রাজর্ষি হর্ষবর্দ্ধন তারি মধ্যে এগিয়ে এলেন সেই জ্ঞানভিক্ষু সন্ন্যাসীর শিবিরে। তিনি তাঁর মাথা লুটিয়ে দিলেন সেই পরম প্রজ্ঞাবান শ্রমণের পায়ের তলায়। চুম্বন করলেন তাঁর পদ-যুগল।

মানবিক ধর্মে হর্ষ ছিলেন সূর্যের মতো ভাস্বর। তাঁর সেই গুণ-রাশিই সফল করে তুলেছিল তাঁর শিলাদিত্য নামকে।

পরম সমাদরে আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করে হর্ষ সাঙকে নিয়ে চললেন কনৌজে।

তখন সবে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের শুরু।

কনৌজে হিউয়েন সাঙের দিন কাটতে লাগল শাস্ত্র-চর্চা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করে। শ্রীহর্ষ নিজে ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এর ওপর তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী। হিউয়েন সাঙকে হর্ষ তাঁর সভায় রাখলেন ঠিক গৃহদেবতার শ্রদ্ধা ও সমাদর দিয়ে। সাঙের সম্মানে তিনি আহ্বান করলেন বিরাট বৌদ্ধ মহাসভার।

সে সভারম্ভে যে মহোৎসব হল তাতে স্বুবর্ণের বুদ্ধ-মূর্তি নির্মাণ করিয়ে শ্রীহর্ষ তা পূজা করলেন বহু আড়ম্বরের সঙ্গে। তারপর বহুদিন ধরে চলতে লাগল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ব্যাপার। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, শ্রমণরা শ্রীহর্ষের রাজত্বে ছিল দেবতার অনুরূপ। তাদের দান করা

হল বহু সুবর্ণ, পরিধেয় ও ভোজ্য। দীন, দরিদ্র থেকে বহু রাজ্যের ছত্রপ রাজারা পর্যন্ত এ উৎসবে সমানভাবে পরিতুষ্ট হল।

হর্ষবর্দ্ধনের দান ছিল জগৎ বিখ্যাত। সে যেন এক সর্বদান যজ্ঞের ব্যাপার। প্রয়াগের মোক্ষ-মেলাতে সাঙকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন।

তারপর একদিন সেই প্রগাঢ় আদর আর আপ্যায়নের মধ্যে, সেই পরম সুখাবহ দিনগুলির মধ্যেও হিউয়েন-সাঙের মন হাঁপিয়ে উঠল। মহাচীনের কথা তাঁর অন্তরে আবার জাগিয়ে দিল পথে বার হবার নেশা।

তিনি সব কথা খুলে বললেন হর্ষবর্দ্ধনকে।

সম্রাটের সদাপ্রসন্ন মুখ সাঙের কথায় নিমেষে ম্লান হয়ে এল। তিনি ভাবলেন এই জগৎবিখ্যাত পুরুষের সঙ্গ হতে এবার তাহলে বঞ্চিত হতে হবে। তিনি সবিনয়ে সাঙকে চীনে ফিরে যেতে বহু নিষেধ করলেন। অনুরোধ করলেন তাঁর সভার সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে চিরদিন ভারতের মাটীকে ধন্য করতে।

সাঙ বললেন—চীন থেকে ভারতবর্ষ বড় কম দূর পথ নয়। চীনে ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্ম এখনো ভালভাবে পৌছায়নি—শুধু এই বিপদময় দূরত্বের জন্যে। আমার এদেশে আসার উদ্দেশ্যেই হল—ফিরে গিয়ে মহাচীনে বৌদ্ধ ধর্মকে জনসাধারণের ধর্ম হিসাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার। আজও আমার দেশের সাধু শ্রমণরা আমার ফেরার পথ চেয়ে বসে আছেন। তাঁরা আমার আগমনের জন্য এখনও নিত্য হয়তো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। উপরন্তু মহারাজ যে লোক এই সদ্ধর্মের মূলনীতি পরিপূর্ণভাবে জেনেও জনসাধারণের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে চায়—সে যেন যাবজ্জীবন চক্ষু হারিয়ে অন্ধ হয়ে থাকে।

হর্ষ ছিলেন একজন পরম বিবেচক ব্যক্তি। এই কথার পর তিনি তাঁর অনুরোধ ফিরিয়ে নিলেন।

তখনই চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ল। হর্ষ নিজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কেমন করে কী কী উপায়ে সাঙের যাত্রার অনুতম কষ্টও দূর করা যায়। তিনি সাঙকে ভারত মহাসাগর দিয়ে চীনে ফেরবার জন্য এক বিরাট নৌ বাহিনী দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সাঙের ইচ্ছে ছিল যে ভারত আগমনের সময়ে মধ্যএশিয়ায় যে সমস্ত অমূল্য প্রীতি ও বন্ধুত্বের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ফেরবার পথে আবার সেই বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার।

সুতরাং তিনি মধ্যএশিয়া দিয়ে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন।

হর্ষ ভারতের ভিতরে বাইরে নানান রাজ্যে পত্রবাহী দূত পাঠালেন যাতে করে এই পরিব্রাজকের বিন্দুমাত্রও কোথাও অসুবিধা না হয়। তারপর প্রচুর ধনরত্ন, পুঁথি প্রভৃতি উপহার দিয়ে ও সঙ্গে একদল রক্ষী-সৈন্য দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন সাঙকে ভারতবর্ষের সীমানা পার করে দেবার।

হর্ষবর্দ্ধন তাঁর হস্তীযূথ থেকে সবচেয়ে ভাল ও শিক্ষিত হস্তীটা দিলেন হিউয়েন সাঙকে। আর আসামের রাজা তাঁকে উপহার দিলেন এক অপূর্ব পশমের পোষাক—বৃষ্টি ও শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য।

বিদায়ের শেষমুহূর্তে—শ্রীহর্ষ আর ভাস্করবর্মা—দু-জনেরই চোখ জলে ভেসে গেল। তাঁরা দুজনেই সাঙের সঙ্গে এলেন বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতে। তারপর তাঁরা ফিরে গেলেন। একা এগিয়ে চললেন হিউয়েন সাঙ উত্তরের দিকে।

তিনদিন পরে হঠাৎ এক জায়গায় এসে সাঙ পিছনে শুনলেন দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরের আওয়াজ। চেয়ে দেখেন হর্ষবর্দ্ধন আর ভাস্করকুমার। তাঁরা তাঁকে একেবারে ছেড়ে দেন নি। তিনি চলে

আসবার পর তাঁরা দুজনে খুব দ্রুতগামী অশ্বে তাঁকে বেগে অনুসরণ করে আশ্চর্যভাবে এসে আবার মিললেন তাঁর সঙ্গে।

এই দেখাই তাঁদের শেষ দেখা। এ হল ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। এরই চার বৎসর পরে ভারতের শেষ একচ্ছত্র সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হিউয়েন সাঙ সিন্ধুনদ পার হলেন। সমস্ত পুঁথি ও বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিকে পার করা হল নৌকাতে আর পরিব্রাজক সাঙ স্বয়ং পার হলেন হাতীর পিঠে। নৌকাতে বইয়ের রাশির সঙ্গে ছিল বহু রকম ভারতীয় ফুলের বীজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নৌকাটি যে মুহূর্তে নদীর মাঝখানে পৌঁছাল অমনি এক বিরাট ঢেউয়ে সেটী ভয়ানকভাবে দুলে উঠল। সাঙ ভয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীরা বহু কষ্টে তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করল। কিন্তু নৌকা থেকে ফুলের সমস্ত বীজগুলি ও পঞ্চাশটী পুঁথি নদীর জলে পড়ে গেল। বাকীগুলিকে রক্ষা করা হল কোন রকমে। এ ক্ষতি সাঙের পক্ষে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়ে গেল। কপিশের রাজা তাঁর এই ক্ষতির কথা শোনামাত্র তখনি সেই সব নষ্ট পুঁথির যথাযথ নকল করিয়ে দিলেন।

কাশ্মীর থেকে কাশ্মীররাজ তাঁর সমস্ত রাজকার্য ছেড়ে চলে এলেন উদ্‌ভাণ্ডে। সাঙের সঙ্গে শেষ দেখা করবার জন্যে।

কপিশ দেশ থেকে সেখানকার রাজা এসে সাঙকে নিয়ে গেলেন কাপিশীতে। তারপর পরম যত্নে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিলেন নাগরাহারা থেকে লম্পকের পথে।

এর পর এল সাঙের ভারতের মাটী থেকে সত্যসত্যই বিদায়ের পালা।

সন্ন্যাসী সাঙের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। যে মাটীতে তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বোধির আলোয় ভরা চিণ্ময় মানস-লোকে—সেই বিরাট ভূ-খণ্ডের দিকে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকালেন। এদিকে প্রাণে বাজছে স্বদেশের ডাক। মুহূর্তে মনকে স্থির করে নিয়ে তিনি কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সেই অমর মন্ত্র—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

পিছনে পড়ে রইল ভারতের পুণ্যভূমি—তার সমস্ত প্রাচীন কৃষ্টি আর সংস্কৃতি নিয়ে। সাঙ পা চালালেন সমুখের পথে।

উনিশ

যে পথ দিয়ে সাঙ ভারতে এসেছিলেন সে পথ দিয়ে কিন্তু তিনি ফিরলেন না। কপিশের রাজা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পর—তিনি একেবারে একলা হয়ে গেলেন। সঙ্গে কেবল রক্ষী-বাহিনী।

সাঙ এবার ধরলেন ভারতবর্ষ থেকে খাশগড়ে যাবার বাণিজ্যপথ। এই পথ চলে গেছে উত্তুঙ্গ হিন্দুকুশ ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীর ছাদ পামীরের উপর দিয়ে। এই পথে তখন ভারতীয় বণিকদের অশ্ব, অশ্বতর আর উটের শ্রেণী যাতায়াত করত ভারতের পণ্যদ্রব্য পিঠে নিয়ে মাঝ এশিয়ার নানান জায়গায়।

কপিশ দেশের রাজা হিন্দুকুশ পার হবার সব রকম ব্যবস্থাই করে দিলেন। তিনি একজন কর্মচারীর অধীনে এক শ' লোক, প্রচুর ঘাস, খড়, খাদ্য, পানীয় আর পাহাড় চড়ার জন্য দরকারী দ্রব্যসামগ্রী আগে থেকেই পাঠিয়ে দিলেন হিন্দুকুশের উপর। যাতে সাঙের সেপথ অতিক্রম করতে কোন কষ্ট না হয়।

৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাঙ হিন্দুকুশ অভিযান সুরু করলেন। সমস্ত কিছুর সুবন্দোবস্ত থাকা সত্বেও কিন্তু তাঁর পাহাড়ে চড়ার কষ্ট কিছুমাত্র কম হল না। সাতদিন ক্রমাগত চড়াই ভাঙতে ভাঙতে সাঙ আর তাঁর দলবল যখন রীতিমতো পরিশ্রান্ত, তখন তিনি দেখলেন যে একটা পাহাড়ের চূড়ায় তাঁরা এসে পৌচেছেন। কিন্তু সেখান থেকে চারিদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেই—তাঁর নির্ভীক মনটা একবার ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিনি তাঁর চার পাশে যেদিকেই চাইতে লাগলেন—চোখে পড়তে লাগল কেবল পাহাড়ের চূড়োর পর চূড়ো। সেই চূড়োগুলি যেমন ভয়ংকর তেমনি তাদের আকারও নানা রকমের।

এই সব পাহাড়ের চূড়োর মধ্যে একদিকে চোখে পড়ল একটা

অত্যুচ্চ উপত্যকা—আর অপর দিকে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পাক খেয়ে উঠে গেছে চক্রিল গিরিবর্ত্ম।

এই সব সঙ্গীনের মতো খাড়াই উঁচু চূড়োগুলি অতিক্রম করতে সাঙকে যে কতো কষ্ট, কত বিপদের সাম্না-সামনি হতে হল—তার একমাত্র মৌন সাক্ষী রইল সাঙের অন্তর্যামী।

একসময়ে তিনি এমন একটা জায়গায় এলেন যেখানে পথ পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে গেছে সোজা খাড়াই। অতি কষ্টে দণ্ডের উপর ভর দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করতে হল এ পথ। সাঙ রইলেন তাঁর দলের সকলের আগে।

এইভাবে আরও সাতদিন কেটে গেল। দুরারোহ পাহাড়ের শিখর থেকে শিখর তিনি পার হয়ে এলেন। এবার তিনি এসে পড়লেন এক গিরিসঙ্কটের মধ্যে।

এইখানে কয়েক ঘর লোকের বাস। তারা ভেড়া পোষে। ভেড়াগুলি আবার এক একটা গাধার মতো বড়। সেই গণ্ডগ্রামে সাঙ একটু বিশ্রাম নিলেন। প্রথম দিনটা কাটালেন তিনি ঘুমিয়ে। তারপরের দিন রাতে সেই গ্রামের লোকেদের ভিতর থেকে একজনকে পথপ্রদর্শক হিসাবে বেছে নিয়ে আবার তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লোকটী একটি পাহাড়ে উটের পিঠে চড়ে তাঁদের পথ দেখাতে লাগল।

হিন্দুকুশের এই জায়গাটী অতি ভয়ংকর। এখানে, যেখান সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে প্রচ্ছন্ন তুষারস্রোত। এইসব স্রোতের উপরকার জলধারা দারুণ ঠাণ্ডায় জমে গেছে শক্ত তুষার হয়ে—কিন্তু ভিতরে চলছে তার তীব্র স্রোতবেগ। কোথাও কোথাও বা পার্বত্য নদীরা জমে গিয়ে শুভ্র তুষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ঐই নদীর উপরকার ভাসা বরফের বুক দিয়ে অতি সন্তর্পণে সাঙ তার দল নিয়ে পার হতে লাগলন।

এখানকার পথ এতো ভীষণ যে নিপুণ পথপ্রদর্শক না থাকলে যে কোন মুহূর্তে পায়ের তলার বরফের নীচে গুপ্তস্রোতে ডুবে যাবার সম্ভাবনা। সাঙের দলের কিছু লোক, কিছু ঘোড়া এইভাবেই তলিয়ে গেল। কিছু মারা পড়ল তুষার-মসৃণ পথ বেয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পাশের অতলস্পর্শী খাদের ভিতর পড়ে। কিছু মারা গেল দারুণ শীতে, রোগে ভুগে। সাঙের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত টিঁকে রইলেন সাতজন শ্রমণ। আর রইল কুড়িজন অনুচর, একটী হস্তী, দশটী গাধা আর চারটী ঘোড়া।

এইভাবে বহু দুঃখ, সুতীব্র কষ্ট ও বিপদের ভিতর দিয়ে দিনরাত্রি পথ চলে সাঙ একদিন এসে পড়লেন হিন্দুকুশের অপর পারে এক গিরিসঙ্কটে।

এ পথও যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। পথের উপর ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি কঠিন মসৃণ, সাদা পাথরের নুড়ি। এদের উপর পা রেখে চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সামনে এখনো রয়েছে এক বিরাট পাহাড়ের চূড়ো—উদ্ধত, নাঙ্গা মাথা উঁচু করে। তার সাদা পাথরের অঙ্গটী যেন তুষারশুভ্র। কোথাও এর একটা গাছপালা নেই। এর সানুদেশে জমেছে হিম-আস্তরণ। জমাটবাঁধা মেঘের রূপ। এই চূড়োটীর উচ্চতা এতো বেশী যে এর উপর তুষারঝটিকা এসে পৌঁচাচ্ছে না। সাঙ যখন সে চূড়োয় পৌঁছালেন তখন দিনের আলো আস্তে আস্তে নিভে আসছে। চারদিকে চোখে পড়তে লাগল কেবল ন্যাড়া পাহাড় আর পাথরের স্তুপ। একটা বিরাট শূন্যতায় সাঙের মন ভরে উঠছিল। রাতের আসন্ন আঁধার তার উপর যবনিকা টেনে তাকে তখুনি সরিয়ে দিল।

পরের দিন তিনি সে চূড়ো থেকে নামলেন। এসে পড়লেন হিন্দুকুশের উত্তর দিকে। তারপর চলতে লাগলেন উত্তরপূর্ব দিকের রাস্তা ধরে—আন্দারাব আর কুণ্ডুজের অভিমুখে। এই পথটা তখনকার

দিনে চলে গিয়েছিল তোখারিস্তান আর বাদাকসান এর ওপর দিয়ে। এই অঞ্চলে তখন রাজত্ব করছিল পশ্চিমতুরস্কের খান বংশের এক ব্যক্তি। তিনি সাঙকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর রাজসভায়।

হিন্দুকুশ পার হতে সাঙ রীতিমতো ক্লান্ত হয়েছিলেন। রাজ-প্রাসাদে সাঙ বিশ্রাম নিলেন সুদীর্ঘ এক মাস। তারপর সেই রাজা আয়োজন করতে লাগলেন—সাঙের পামীর উপত্যকা পার হবার।

পামীরের পার্বত্য উপত্যকায় পদার্পণ করে সাঙ লিখলেন—এই অঞ্চলে সব সময়ে বিরাজ করছে একটা থমথমে বিষণ্ণ ভাব। এর চারদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলি চিরতুষারাবৃত। সমুদ্রকূল থেকে এ অঞ্চল এতো উঁচু যে এখানে গাছপালা, ফলফুল জন্মায় অতি অল্প। বরফের ঝড় দুরন্তবেগে সব সময়ে এর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানে শীত এত প্রচণ্ড যে এখানকার বাসিন্দারা জানোয়ারদের সঙ্গে পাহাড়ের গুহায় জড়াজড়ি করে কোন রকমে বাস করে।

পামীরের চীনা নাম হল—সুং-লিং। এর অর্থ হল 'পলাণ্ডু পর্বত'। এই অঞ্চলে খুব বেশী পেঁয়াজের চাষ হয়। পামীরের প্রধান উপত্যকাটী হল পূবপশ্চিমে প্রায় হাজার লী, আর উত্তর-দক্ষিণে এক শ' লী। সবচেয়ে সরু জায়গাটী অন্ততঃ দশ লী চওড়া। এর শীতের উল্লেখ তো আগেই করা হয়েছে। আর শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত সব সময়েই হু হু করে বইছে বরফের ঘূর্ণি ঝড়। এর মাটীতে নুণের ভাগ বড় বেশী। তাই এখানে কোন শস্যের চাষ হয় না। জন মানবের বাসও এখানে অনেক কম। পামীরের উচ্চতা হল তেরশ'-চৌদ্দশ' ফিট। সাঙ লিখলেন—

এই উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রে একটা হ্রদ আছে। হ্রদটা সমগ্র জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থল। জম্বুদ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা

হল এই উপত্যকা। হ্রদের জল কাক চক্ষুর মত নির্মল। জলের বর্ণ ঘন নীল আর স্বাদে অপূর্ব। এই হ্রদের গভীরতা যে কত তা কেউ জানে না। এর মধ্যে বাস করে হাঙ্গর, মকর, কূর্ম আর ড্রাগন। এই হ্রদের চার পাশে আছে নানান পাখীর বাসা। আছে নানা রকমের বন্য-হংস, সারস, মরালের দল।

যে হ্রদের উল্লেখ সাঙ করেছেন তার বর্তমান নাম হল সার-ই-কুল বা ভিক্টোরিয়া। অত দীর্ঘদিন পূর্বেও সাঙের বর্ণনা এখনকার পামীরের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এখনকার বর্ণিত পৃথিবীর ছাদ—তখনকার দিনে সাঙের নজর এড়ায়নি। তাই তিনি পামীরকে জম্বুদ্বীপের সর্বোচ্চ স্থান বলে বর্ণনা করে গেছেন।

পামীরের নির্জন উপত্যকা পার হবার সময় সাঙ দেখা পেলেন—এক বণিক দলের। নির্জনতা তাঁর পক্ষে এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে এই সাহচর্য পেয়ে তিনি যেন বেঁচে গেলেন। দিনের পর দিন তাঁরা পাহাড়ে পথ অতিক্রম করে যেতে লাগলেন। চলতে লাগল নানা গল্পগুজব। বণিকদলের নেতাটি ছিলেন একজন ভাল গল্প বলিয়ে। তিনি শোনাতে লাগলেন তাঁকে নানান গল্প—স্থানীয় লোক-কথা। এক জায়গায় দেখা গেল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট পাহাড়ের দেওয়াল। দলের নেতা সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—এই পাহাড়ের ভিতর একটি অতি গোপন স্থানে দুটিগুহা আছে। গুহা দুটীর অবস্থান হল গভীর পাথরের স্তূপের মধ্যে। সেখানে দুজন অর্হৎ সাতশ' বছর ধরে গভীর ধ্যানে সমাহিত আছেন। এই দীর্ঘকাল যদিও তাঁরা কিছুমাত্র আহার করেননি বা জীবন্ত মানুষের কোন লক্ষণ তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না—তবুও তাঁদের শরীরে কোনরকম পচন নেই। তাঁরা স্থির হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন।

আরও কিছুদূর এসে হিউয়েন-সাঙ এক গ্রাম্য লোকের মুখে এই রকম একটা কাহিনী শুনলেন। এই অঞ্চলে একটা অতি উঁচু

পাহাড়ের চূড়া আছে। চূড়াটি সব সময়েই বরফ আর কুয়াশায় ঢাকা। হঠাৎ চোখে পড়লে মনে হয় পাহাড়ের চূড়াটী নিরালম্ব হয়ে যেন শূন্যে ঝুলছে। একদিন সেই চূড়াটীর কিছুটা অংশ বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ভিতরকার কিছুটা অংশ বেরিয়ে পড়ল। সেই খোলা ভাঙ্গা জায়গায় দেখা গেল—এক মুদিত চক্ষু, জ্যোতির্ময় তপস্বী একমনে তপস্যায় নিমগ্ন। তাঁর শরীর বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত। শ্মশ্রু আবক্ষ আর কেশরাশি পিছনে পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করেছে। সেই অবস্থায় সেই যোগীকে দেখতে পায় কয়েকজন শীকারী আর কাঠুরে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর আশপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বহুলোক এসে জমা হয় সে দৃশ্য দেখতে। তারা সবাই ভাবতে লাগল এ শরীরে প্রাণ আছে কী না? একজন শ্রমণ জানালেন যে যোগীরা যোগের দ্বারা কালকে অতিক্রম করেন। সুতরাং কালের প্রভাবে তাদের শরীর জীর্ণ হয় না। তাঁদের এই মর-দেহ এক জ্যোতির্ময় সত্তায় রূপায়িত হয়ে জরা-মরণ-ব্যাধিকে এড়াতে সক্ষম হয়। ইনি হলেন সেইরকম একজন মহাযোগী। এঁর ধ্যান ভাঙ্গাতে হলে—এঁর পায়ে-হাতে তেল আর মাখন ডলতে হবে। শরীরের ভিতরকার হাড়ের খিল খুলতে হবে। এঁর কানের কাছে বাজাতে হবে মাঙ্গলিক তুরী। কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই এঁর সমস্ত অস্থি-মজ্জা রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। অতঃপর গ্রামবাসীরা শ্রমণের কথামতো সেই মহাযোগীর কানের কাছে মাঙ্গলিক তুরী বাজাতে লাগল। বহুক্ষণ পরে যোগীবর চক্ষু চাইলেন। সম্মুখে সেই শ্রমণকে দেখে তিনি শুধালেন—হে খর্বাকৃতি বামন, কে তুমি?

শ্রমণ যথাযোগ্য উত্তর দিলেন।

অতঃপর সেই যোগী বললেন—তুমি যেই হও—তুমি কী আমাকে আমার প্রভু বুদ্ধ কাশ্যপের সংবাদ জানাতে পার?

প্রভু বুদ্ধ-কাশ্যপ হলেন—গৌতমের বহুসহস্র বৎসর পূর্বেকার জাতক। শ্রমণ উত্তর দিলেন—প্রভু বুদ্ধ-কাশ্যপ বহুকাল মহানির্বাণ লাভ করেছেন।

যোগী তখন জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান বুদ্ধ কী শাক্যমুনিরূপে জন্ম নিয়েছেন এ পৃথিবীতে?

শ্রমণ উত্তর করলেন—ভগবান বুদ্ধ শাক্যমুনিরূপে এ পৃথিবীতে দেহধারণ করেছেন। তাঁর অমৃতময়ী বাণীতে—শান্তি, মৈত্রী ও কারুণ্যের ধারায় তিনি জগৎকে নতুন পথ দেখিয়ে—আবার নির্বাণ লাভ করেছেন।

এই কথা শুনে সেই মহাযোগী আবার তাঁর চক্ষু বন্ধ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর সেই সূক্ষ্ম শরীর বাতাসে ভর করে ভেসে উঠল। তারপর সেখানে দপ করে জ্বলে উঠল আগুনের শিখা। সবাই দেখলেন নীচে ঝরে পড়েছে কতকগুলি ভস্ম। সেই ভস্মস্তূপের ওপর সেখানকার রাজা তৈরী করিয়ে দিয়েছেন একটি স্তূপ। সাঙ পাহাড়-ঘেরা সেই স্তূপটী আসবার পথে দেখে এলেন।

কিছু দূর এসে পামীর আর মুস্তাখ এর মাঝখানে এক উপত্যকার মধ্যে সাঙ আর তাঁর দল ডাকাতের হাতে পড়লেন। এখানে কোন-ক্রমে সবাই পালিয়ে গুহার মধ্যে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু হাতীটী সেই সময়ে খাদের মধ্যে পড়ে মারা গেল।

এই সব দারুণ কষ্টের মধ্যেও সাঙ একদিন পামীরের বিপদসঙ্কুল মালভূমি পার হয়ে এলেন। এসে পড়লেন উত্তর পারে খাশগড়ে।

খাশগড়ের ভারতীয় নাম কাশ। সেদিন হিউয়ন্ সাঙ কাশকে যে অবস্থায় দেখেছিলেন—আজও খাশগড় ঠিক সেই রকমই আছে। বালি আর পাথরের রুক্ষতার মধ্যে একটুকরো সবুজ ওয়েসিস। এই ওয়েসিস্টুকুতে একটু বৃষ্টি হয় অথবা একটু প্রস্রবন বয়। তারই জন্য

এখানে একটু চাষও হয়। আর শস্যাদিও জন্মায়। এখানকার কার্পেট বা গালিচা জগৎবিখ্যাত। খাশগড়ীরা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্য দেখাতে পারে গালিচা বুনতে।—লিখলেন সাঙ।

খাশগড়ীদের চোখের মণি সবুজ। তারা যে শক জাতি থেকে উদ্ভূত তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। এরা ধর্মে বৌদ্ধ কিন্তু হীনযান সম্প্রদায়ের। বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ তারা মানে না। তারা বাস্তব-পন্থী—সর্বাস্তিবাদী। তাই সাঙ মন্তব্য করেছেন—এরা শাস্ত্রপাঠ করে বটে তবে তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কিনা সন্দেহ।

খাশগড় ছাড়িয়ে সাঙ পার হলেন কিজিল দরিয়া আর তার দক্ষিণের শাখানদীগুলি। শেষে তিনি এসে পড়লেন ইয়ারকন্দে। ইয়ারকন্দেরও গালিচা শিল্পে বিশেষ নাম। ইয়ারকন্দের ভিতর দিয়ে সাঙ এসে পড়লেন খোটানে।

খোটানও খাশগড়ের মতো একটুকরো ওয়েসিস্। এখানকার জমিতে তুঁতফলের চাষ হয়। সেই সব তুঁত গাছে আবার চাষ হয় রেশম কীটের। প্রাচ্যের মধ্যে চীনদেশের রেশমশিল্পের স্থান অতি প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গের। সাঙ যখন মধ্য এশিয়া আর ভারতবর্ষ পর্যটন করছিলেন সেই সময়ে চীনের লোকেরা রেশমশিল্প যাতে বিদেশে কোন রকমে যেতে না পারে—সেইজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। এদিকে খোটান রাজ চীনের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। আর সেই কন্যা স্বামীগৃহে আসবার সময়ে স্বামীর অনুরোধে তাঁর শিরাচ্ছাদনীর ভিতর লুকিয়ে নিয়ে এল কতকগুলি রেশমকীট ও তুঁতফলের বীজ। তখন থেকে সেখানেও রেশম শিল্পের সুরু। খোটানের অধিবাসীরা সবাই বৌদ্ধ।

এখানকার বিদগ্ধজনের ভাষা হল সংস্কৃত। এইসব অধিবাসীরা সাঙকে অতি উচ্চাঙ্গের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনে মুগ্ধ করেন। সাঙ লিখেছেন—খোটানের অধিবাসীরা অত্যন্ত ন্যায় ও আচারনিষ্ঠ।

এদের বিদ্যা ও সঙ্গীতের ওপর অনুরাগ প্রবল। এরা অতি সৎ প্রকৃতির ও উঁচু দরের কৃষ্টি সম্পন্ন। এই বিষয়ে এদের সঙ্গে মাঝ এশিয়ার যাযাবর জাতিদের পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

সাঙ খোটানে এসেছিলেন ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে তিনি কিছুদিন কাটিয়ে চীনদেশের পথ ধরলেন।

গোবির ওপর অনেকগুলি ওয়েসিস একের পর এক পড়ে আছে একটা শ্রেণী তৈরী করে। তারই সবকটার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চললেন সাঙ। এপথে যেতে তাঁর বিশেষ কোন কষ্ট পেতে হল না। ভারতে যাবার সময়ে যে কষ্ট তাঁকে বার বার মরুভূমিতে মৃত্যুর মুখোমুখি করে দিয়েছিল—এবার তিনি সে কষ্টকে এড়িয়ে গেলেন। উপরন্তু এইসব মরুদ্যানের অধিকর্তাদের মধ্যে সাঙের নামডাক পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের রাজ্যে সাঙকে অশেষ আদর-আপ্যায়ন করে স্থান তো দিলেনই—সমস্ত ব্যবস্থাও করলেন মাঝখানের মরুভূমিগুলি সহজে অতিক্রম করবার।

এইসব ওয়েসিস্ অতিক্রম করে এসে সাঙ হাজির হলেন তুং-হুয়াংএ। তুং-হুয়াং সহর ছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর সবচেয়ে সে প্রয়োজনীয় ছিল যেজন্য সে হল সুদূর পশ্চিম থেকে মরুভূমি টপকে চীনে আসতে বণিকরা পথের পরম ক্লান্তি অপনোদন করত—এই সহরে কয়েকদিন জিরিয়ে।

তুং-হুয়াংএ এসে পরিশ্রান্ত পর্যটক হিউয়ন সাঙ থামলেন। থামলেন শুধু ভ্রমণের ক্লান্তি আর অবসাদ দূর করতেই নয়। বোধহয় তাঁর মনের গভীরে কোথায় যেন একটু দ্বিধা জেগে উঠেছিল চীনে প্রবেশ করতে। যে চীন তিনি ত্যাগ করেছেন পনেরো বছর আগে কাউকে না জানিয়ে, সম্রাটের বিনা অনুমতিতেই,—সেখানে তাঁকে

সম্রাট আবার কীভাবে গ্রহণ করবেন—সে কথা ভেবে সাঙ বারেকের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেন।

তিনি তুং-হুয়াং-এ বসে এক পত্র প্রেরণ করলেন সম্রাট তাই-সুংএর কাছে। তাতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন তাঁর মধ্যপ্রাচ্য ও ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার। লিখলেন—সর্ব-দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতির জ্ঞান নিয়ে, বিশেষ করে মহাভারতের অধ্যাত্মবাদের মূলসূত্র বুকে ধরে পরিশ্রান্ত শ্রমণ আজ মহাচীনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। জন্মভূমি পরিত্যাগের সময় যে অনুমতির প্রত্যাশা তিনি করেননি—জন্মভূমিতে ফিরে আসার সময় সম্রাটের সেই অনুমতির প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন।

তাই-সুং পত্র পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। চীনের এক ভিক্ষু পনের বছর পূর্বে তাঁর বিনা অনুমতিতেই, সহায়সম্পদহীন অবস্থায়, শুধুমাত্র ভগবান বুদ্ধের নাম সম্বল করে—সমগ্র মধ্য-প্রাচ্য ও ভারতের পুণ্যভূমি পর্যটন করে এলেন—তাঁর জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য। কি অপূর্ব এ আত্মশক্তি! কী অপূর্ব তাঁর অন্তরের প্রেরণা! এ প্রেরণার কাছে তিয়ানসান, আলতাই আর হিমালয়ের উচ্চতাও তুচ্ছ হয়ে যায়। ভীষণ মরুভূমির কষ্ট আর পথের সবকিছু বিপদও তাঁর আত্মশক্তির কাছে হার মেনে গেল।

সম্রাট তাই-সুংএর মহৎহৃদয় মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি স্মরণ করে দেখলেন পনেরো বছর পূর্বে কোন এক অজানা দিনে এক অজ্ঞাত পরিচয় ভিক্ষু কখন যে মহাচীনের এলাকা পার হয়ে গেছেন তাঁর কিম্বা তাঁর কর্মচারীদের সেকথা মনেও নাই। এখন শুধু দেখা যাচ্ছে অর্ধ-পৃথিবীব্যাপী যশের আলোতে ভাস্বর—মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্তিমান, মহাজ্ঞানী ও প্রাচ্যের এক বিখ্যাত পর্যটক হিউয়েন সাঙ মহাচীনের দরজায় তাঁর আদেশের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমান। এই মহাভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মের মহারত্ন তাঁরই দেশের একজন অধিবাসী—চৈনিক। এত বড়

সৌভাগ্যে তাই-স্থং নিজেও গর্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি তক্ষুনি সারা চীনদেশে সাঙের আগমন বার্তা ছড়িয়ে দিলেন। আর সাঙকে সাদরে আহ্বান করলেন—একদল ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে—তাঁকে রাজধানীতে আনবার জন্য।

৬৪৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল। চীনের সমস্ত গাছপালা শীতের ছোঁওয়া থেকে সবে জেগে উঠেছে। নবপল্লব মাঙ্গলিকের মতো গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে। পথের ধারে ফুল ফোটার আর বিরাম নেই। বসন্তের হাওয়ার ছোঁওয়ায় চারদিক রমণীয় হয়ে উঠেছে। এমনি সময়ে একদিন রাজধানী চাং-আনের মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে ছড়িয়ে গেল হিউয়ন-সাঙের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা।

সহরের শাসন কর্তা সাঙকে উপযুক্ত অভ্যর্থনায় গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আমন্ত্রণে চাং-আনের সমস্ত বিহার আর সঙ্ঘারামের শ্রমণরা পথে শোভাযাত্রা করে দাঁড়ালেন। তারপর এক গম্ভীর পবিত্র কার্যসূচীর মধ্যে সেই বিখ্যাত পর্যটক তাঁর সঞ্চয় করে আনা সমস্ত পুঁথি, বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, নানান দেশের স্মৃতিচিহ্ন—সব অর্পণ করলেন চাং-আনের হুং-কো-স্থং সঙ্ঘারামের মহাথেরের হাতে।

তারপর এক বিরাট শোভাযাত্রায় পথ ছেয়ে গেল। তাতে যোগ দিলেন নগরের যত বিদগ্ধজন, রাজকর্মচারীরা আর জনসাধারণ। ফুলে ফুলে পথ ছেয়ে দেওয়া হল। এই শোভাযাত্রার শোভা বর্ধন করে পতাকা, চন্দ্রাতপ, বহুমূল্য শিবিকা, বেদী আর গালিচা বহে নিয়ে চলল দলে দলে, লোকের পর লোক। সেই শোভাযাত্রায় জনসমাগম এত বেশী হতে লাগল যে ভীড়ের চাপে পাছে লোকের প্রাণনাশ হয়—এই ভেবে নগরের শাসনকর্তা হুকুম দিলেন সবাইকে দুই শ্রেণী হয়ে রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সমস্ত নাগরিক আনন্দে উৎসাহে, ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল পুড়িয়ে অভিনন্দিত করতে লাগল হিউয়েন সাঙকে। আর গম্ভীর মন্দ্রে স্তব-গাথার সঙ্গে অগণিত জনকণ্ঠে গীত হতে লাগল—

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

———

পরিশিষ্ট

মহামণীষী হিউয়েন সাঙের চীনে ফিরে আসার পরের ইতিহাস যদিও চোখ ধাঁধিয়ে দেবার বা বিস্মিত করবার মতো কিছু নয় তবুও তা পৃথিবীর কৃষ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞানপ্রচারের কি থেকে—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ম-গুরু সাঙ চীনে ফিরে আসার পর সম্রাট তাই-সুং তাঁকে নানান দেশ, সেখানকার আবহাওয়া অধিবাসীদের রীতিনীতি প্রভৃতি নানান বিষয় সম্পর্কে বিবিধ প্রশ্ন করে সব কিছু জেনে নিতে লাগলেন। সাঙও সম্রাটকে সুদূর পশ্চিমে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষায় সাহায্য করতে লাগলেন প্রচুর।

শেষে সম্রাট তাই-সুং ধর্মগুরু সাঙকে তাঁর রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদ অলংকৃত করবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সাঙ সে প্রস্তাব পরম বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বললেন—মহারাজ, আমি ভিক্ষু, সন্ন্যাসী। সংসারের সমস্ত ব্যাপার আমি বহুদিন ত্যাগ করেছি—শুধু প্রভু বুদ্ধের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করব বলে। যদি কনফুসিয়াসের ধর্ম নিতাম তবে শাসক হবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন আমি পঞ্চশীলের উপাসক। সেখানে শাসনের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এর পর থেকে সাঙ যে কাজে মন সংযোগ করলেন তা হল ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছ'শ পুঁথির চীনা ভাষায় অনুবাদ। তিনি সহরের কোলাহল থেকে বহুদূরে নিতান্ত নির্জনে নিস্তব্ধ অরণ্য পর্বতে ঘেরা সাঙ-লিন-সুর সংঘারামে চলে গেলেন। তারপর গভীরভাবে ডুবে গেলেন এই মহৎ কর্মের সমুদ্রে।

কিন্তু সম্রাট তাই-সুং তাকে খুব বেশীদিন তাঁর নিজের চোখের আড়ালে থাকতে দিলেন না। তাই চাং-আনের সহরপ্রান্তে একটী

মনোরম স্থানে সাঙের জন্য একটী সুন্দর বাসস্থান নির্মাণ করিয়ে দিলেন। সেখানে সাঙ বহু চীনা পণ্ডিতদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক বিরাট অনুবাদকের দল। এই সব পণ্ডিতরা নিঃশব্দে কাজ করে যেতে লাগলেন—অনুবাদ করে যেতে লাগলেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত নানা গ্রন্থ। তাঁরা গভীর মনঃস্বীতার সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় ভাষার সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি পর্যন্ত চীনা পরিভাষায় রূপ দিতে লাগলেন।

এইভাবে তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রথম গ্রন্থ-সংকলন প্রকাশিত হল ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে। সেই সংকলন হিউয়েন-সাঙ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে দিলেন সম্রাট তাই-সুং এর হাতে।

৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সম্রাট তাই-সুং মারা গেলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর থেকে সাঙ তাঁর আবাস গৃহের বাইরে বার হওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

তিনি সকাল থেকে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত বসে কেবল অনুবাদের কাজ করতেন। তারপর উঠে তাঁর প্রভু বুদ্ধের উপাসনা করতেন। উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করে তিনি প্রভুর মহিমা কীর্তন করতেন। তারপর ঠিক করতেন পরের দিন কোন কোন কাজে হাত লাগাবেন। উপদেশ দিতেন শিষ্যমণ্ডলীকে। তাদের নির্দেশ দিতেন নতুন নতুন কাজের।

৬৬০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত প্রজ্ঞা-পারমিতা গ্রন্থখানির চীনা অনুবাদ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তিনি অনুভব করলেন তাঁর পরপারে যাবার ডাক এসেছে।

তিনি শিষ্যবর্গকে বললেন—আমার এ জীবন শেষহয়ে এসেছে—আমি বেশ স্পষ্ট অনুভব করছি। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার দেহকে শেষ আবাসে পৌঁছে দিও। সে আবাস যেন হয় নিতান্ত সাধাসিধা। সবচেয়ে ভাল হবে যদি এই মর দেহকে একটা

মাদুর জড়িয়ে কোন নিস্তব্ধ, নির্জন, উপত্যকার বুকে পুতে দিয়ে এস।

তারপর তিনি লান-চিতে বুদ্ধ মূর্তি দর্শন করতে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন শুধু মাত্র ধ্যান-ধারণাতে।

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বে স্বপ্নোত্থিতের মতো সাঙ বললেন—আমি দেখছি—আমার চোখের সুমুখে একটা প্রকাণ্ড রক্ত-কমল ধীরে ধীরে তার সহস্রদল বিকশিত করছে। আহা কী সুন্দর এর শোভা, কী অপরূপ প্রাণপ্রাচুর্য এর দলগুলিতে। পরম-পবিত্র দিব্যভাবে কী অপূর্ব জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল পদ্মটা।

তারপর একটু থেমে—ধীর গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—হে হিউয়েন সাঙ নামধারী নশ্বর দেহ, তোমার কাছ থেকে এবার আমার বিদায়। অশেষ পুণ্য কর্মের দ্বারা যে প্রজ্ঞা আমি অর্জন করেছি—যে প্রজ্ঞা আমি সংখ্যাতীত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি—আশা করি সে বার্তা একদিন স্বর্গে সেই পরম উপাস্যের কাছে পৌঁছাবে। সেই অপার করুণাবিমণ্ডিত বোধিসত্ব মৈত্রেয় তাকে প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করবেন। এই মর জগতে যদি আমার আবার জন্ম হয় তবে আমার প্রার্থনা রইল যেন জন্মে জন্মে যুগে যুগে আমি সেই পরম পবিত্র, পরম শান্তিময় বুদ্ধের বাণীকে সারা জীবন দিয়ে রূপ দান করে সমগ্র মানুষের কাছে নির্বাণের স্বরূপকে প্রকাশ করে যেতে পারি।

তারপর অজস্র বন্ধু ও শিষ্যমণ্ডলীর কাছে বিদায় নিয়ে সেই অমিত-জ্ঞানী গভীরতর ধ্যানের মধ্যে ধীরে ধীরে নিমগ্ন হয়ে যেতে লাগলেন।

সর্ব শেষ প্রার্থনায় তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হল—

হে করুণাঘন মৈত্রেয়, তথাগত, আমার অন্তরের যত শ্রদ্ধা, যত ভক্তি, এ সবই তোমার। তুমিই আমার অন্ধকার মনে বোধির আলো জ্বালিয়েছ প্রভু। পৃথিবীর সর্বসাধারণ মানুষের সঙ্গে আমারও আকুল প্রার্থনা—তুমি একবার আমাকে তোমার সেই প্রশান্ত, জ্যোতির্মণ্ডিত রূপটী দেখাও। হে জগতের সর্ববন্ধন হারী, অনন্ত দুঃখ-ত্রাতা, আর্তের দেবতা—আমার এ উপাসনা এ সবই তোমারই জন্য। হে কৃপাময়, নিত্যশুদ্ধ বোধিরসত্ত্বা, এ দেহের অবসানে আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও নাথ।

তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বহুক্ষণ তাঁর মুখাবয়ব ঘিরে রইল সেই অপার্থিব জ্যোতির্মণ্ডল। মুদিতচক্ষু মুখটী ঘিরে খেলা করতে লাগল—অপার আনন্দের অনাবিল দ্যুতি।

হয় তো তাঁর শেষ প্রার্থনাই পূর্ণ করলেন ভগবান তথাগত। সাঙ প্রয়াণ করলেন সেই অবাঙ-মানস-গোচর অনাহত আনন্দলোকে—যেখানে সর্বদা বিরাজ করছে—

অশোকং বিরজং খেমং সর্বং মঙ্গলমুত্তমম্

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!